# খেলার কাগজ

খেলাধূলোর নির্ভীক পাক্ষিক

১ মার্চ ১৯৮১



জামশিদরা কি কলকাতায় খেলতে পারবে?




পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

# একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



অরুণ ঘোষ, পি কে ব্যানার্জি ও হাকিম

# খেলার কাগজ

১ মার্চ ১৯৮১


## এই সংখ্যায়



**বিমান মাশুল : অতিরিক্ত ২০ পয়সা**

## অভিনন্দন !

- প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে—কোনঠাসা ফুটবলারদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।
- মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে—ফুটবলারদের ক্যাম্প-ছাড়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংযত এবং সঙ্গত মনোভাব দেখানোর জন্য।
- করণ দুবে, অনিল ভরদ্বাজ এবং বরুণ বর্মণকে—দলীপ ট্রফি ফাইনালে প্রশংসনীয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য।

## ধিক্কার !

- পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকে—ফুটবলারদের সম্পর্কে প্ররোচনামূলক মন্তব্য করার জন্য।
- উমাপতি কুমার এবং ধীরেন দে-কে—মোহনবাগানের আট ফুটবলারের বিরুদ্ধে এক-তরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।
- সেই দেশপ্রেমিকদের —ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অফিসের সামনে যারা ভাস্কর আর মনোরঞ্জনকে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করেছিলেন।


**সম্পাদক : অশোক দাশগুপ্ত**

**বার্তা সম্পাদক : সরোজ চক্রবর্তী।**

প্রচ্ছদের ছবি : শ্রেণিক শেঠ, অন্যান্য ছবি : প্রদীপ সোম, শান্তি সেন, শ্রেণিক শেঠ, কসমস প্রেস অ্যাসোসিয়েটস, এস এল কাঞ্জিলাল, জহর রায় এবং পি কে চৌধুরী।


# কেন যাচ্ছি

অশোক দাশগুপ্ত

খেলার কাগজের সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত একটি দৈনিক পত্রিকার স্পোর্টস এডিটর হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। এজন্য আমরা অবশ্যই আনন্দিত।

কিন্তু একই সঙ্গে আমরা দুঃখিত। কারণ একটি দৈনিক পত্রিকার স্পোর্টস এডিটর হবার পর তাঁর পক্ষে আর এই পত্রিকার সম্পাদক থাকা সম্ভব নয়।

তবে, আমরা শুধু আনন্দিত বা দুঃখিত নই—আমরা আশ্বস্ত। কেননা আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর পরামর্শ সব সময়েই নেবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, অশোক দাশগুপ্ত এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখবেন।

**প্রকাশক, খেলার কাগজ**

প্রিয় পাঠিকপাঠিকাদের কাছে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন আছে। কোন্ অশোক দাশগুপ্তকে আপনারা চেনেন-জানেন— সম্পাদক না, লেখক? আগামী সংখ্যা থেকে আমি আর এই পত্রিকার সম্পাদক থাকছি না। কিন্তু লেখক হিসেবে থাকছি।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, এই সংক্ষিপ্ত রচনা সকলের পড়ার জন্য নয়। আমি বক্তব্য রাখছি শুধু তাদের কাছে, যারা আমাকে এবং আমাদের প্রবলভাবে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করেছেন। অন্যদের কাছে, এই রচনা ব্যক্তিগত এবং অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে হবে।

এই সংখ্যা থেকে অন্য একজন সম্পাদক হলেন। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এই পত্রিকার চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি সম্পাদনা না করলেও, সম্পাদকীয় দপ্তরের সকলেই থাকবেন—সব কিছু আগের মতোই চালানোর জন্য।

ব্যাপারটি নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। এবং প্রায় সকলেরই ধারণা এই যে লেখক হিসেবে আমার জড়িত থাকাটাই জরুরী, সম্পাদক হিসেবে না থাকলে, সহযোগীরা কয়েকদিন অসুবিধা বোধ করলেও, পত্রিকার কোনো ক্ষতি হবে না। যে পাঠক-পাঠিকারা প্রবল মমতায় এই নির্ভীক পাক্ষিককে বড় করে তুলেছেন, তাঁরা আমাকে লেখক হিসেবেই জানেন। সেই সম্পর্ক অটুট থাকবে।

প্রশ্ন হল, কেন যাচ্ছি ? ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং ক্যারিয়ারের ব্যাপারটি একেবারেই নেই তা নয়। আছে। কিন্তু আরো কিছু কারণ আছে, যা আপনাদের জানানো দরকার।

দু'টি পত্রিকার প্ল্যাটফর্ম থেকে গত তিন বছরে কিছুটা অন্যরকম সাংবাদিকতা করার চেষ্টা করেছি। অন্যায় মনে হলেই খোলাখুলি আক্রমণ করেছি। তারুণ্যের আবেগে নিশ্চয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

# দেশপ্রেমের জোয়ার

**অশোক দাশগুপ্ত**

"গড সেইড লেট দেয়ার বি লাইট, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট।" —ঈশ্বর বললেন আলো হোক, আলো হল। আনন্দবাজারের স্টাফ রিপোর্টার বললেন একুশজন ফুটবলার দেশদ্রোহী, সুতরাং ওরা দেশদ্রোহী হয়ে গেল। এবং অতঃপর, দেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব জোয়ারে কলকাতাসহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ প্লাবিত হল। ব্যবসাসূত্রে দেশ এবং সরকারকে যথেষ্ট ফাঁকি দেন এমন লোকেরা ক্লাব কর্মকর্তা হিসেবে দেশপ্রেমিক হলেন। যে ব্যাঙ্ক কর্মচারী ওভারটাইম ছাড়া আর কিছু বোঝেন না তিনিও দেশপ্রেমিক হয়ে ফুটবলারদের ওপর চড়াও হলেন। অন্য ক্লাবের সমর্থক — এই অপরাধে অনাদের যিনি বা যাঁরা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন, তিনি বা তাঁরাও দেশপ্রেমিক হিসেবে ঘোষণা করলেন—ক্লাবপ্রীতি খুব খারাপ জিনিস, সবার আগে দেশ। আর হ্যাঁ, প্রচুর পত্রিকা বিক্রি হল।

## ফুটবলাররা কি দোষী নয়?

উপরোক্ত ভূমিকার পটভূমিকায় এ প্রশ্ন স্বভাবতই জাগতে পারে, তাহলে কি আমরা মনে করি যে ফুটবলাররা দোষী নয়? খুব স্পষ্ট করে বলি, ক্যাম্প ছেড়ে ফুটবলাররা অন্যায় করেছে। কিন্তু এটা যতটা অন্যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি বোকামি। এই মূর্খতার দায় মেটাতে গত কয়েকদিনে কলকাতার সেরা ফুটবলারদের যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছে। এবং হবে। ক্যাম্প ছাড়লে জনমানসে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, সে সম্পর্কে চিন্তাই করা হয়নি। করলে, এত বড় ভুল কেউ করত না। কোনো কোনো ভুল শুধুমাত্র গভীরতার জন্যই অন্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কিন্তু 'দেশদ্রোহী'? দুঃখিত, মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।

## ওরা কেন ক্যাম্প ছাড়ল?

একথা খুব স্পষ্টভাবেই সকলে বলছেন যে শুধুমাত্র টাকার জন্যই ফুটবলাররা ক্যাম্প ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খানিকটা আমতা আমতা করে আলোচনাকে অন্যখাতে ঘুরিয়ে নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে, ত্যাগ খুবই ভাল জিনিস—যদি তা অনাদের করতে হয়। সরাসরি বলি, টাকার কথা কে ভাবে না? আমি ভাবি না? আপনি ভাবেন না? নিজের বাবা-মার চিকিৎসার জন্য, বোনের বিয়ের জন্য, ভাইয়ের লেখাপড়ার জন্য টাকার চিন্তা করা অপরাধ? কলকাতায় খোলাখুলি পেশাদার ফুটবল চালু করার দাবি যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যতোদিন তা না হচ্ছে, ফুটবলাররা বিনে পয়সায় খেলবে, এমন আশা করা কি মূর্খতা নয়? দিনের পর দিন ভোরবেলা মাঠে হাজির হয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে থেকে ক্লাবের হয়ে বিভিন্ন টুর্ণামেন্ট খেলা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে—ঘাম আর রক্তে ভিজিয়ে ফুটবল মাঠে রেখে আসা — এসব তো দু-চারদিনের সখের ব্যাপার নয়। এজন্য ফুটবলাররা টাকা পেলে চোখ টাটানোর কী আছে? মহাবীর প্রসাদ বা নায়ারের মতো জাত ফুটবলাররা অর্থকষ্টে ভুগবেন, আর আমরা মাঝেমধ্যে দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে মহৎ সাজব — এতো চলতে পারেনা। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, প্রায় সকলেই 'বড় টীমের ফুটবলারদের' উপর এক হাত নিচ্ছেন। কিন্তু কেউ কি জন্মেই বড় টীমের ফুটবলার হয়ে যায়? শ্যামনগরের সুব্রত ভট্টাচার্য বা কেশবপুরের বিদেশ বসুকে কি ছোট টীমের সোপান পেরিয়ে নিজেদের সাধনা এবং পরিশ্রমের জোরেই 'বড় টীমের ফুটবলার' হতে হয়নি? নানা জায়গায় বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর প্রভূত প্রশংসা শুনছি। বিশ্বজিৎ বেশ ভাল ছেলে। একথাও অনস্বীকার্য যে ও ভুল সিদ্ধান্ত নেয়নি। একুশজন বেরিয়ে আসার পর বিশ্বজিৎও চলে আসতে চেয়েছিল, শুনেছি অরুণ ঘোষ আটকেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, তিন বড় টীমের ফুটবলারদের মতো বিশ্বজিতেরও প্রচুর অর্থ পাবার নিশ্চয়তা থাকলে — ও কি ক্যাম্পে থাকত? হয়তো থাকত। তবে, আমি বিশ্বাস করিনা।

সেদিন সুরজিৎকে বলছিলাম, "দুই কোচ পি কে ব্যানার্জি এবং অরুণ ঘোষও তো (বিশেষত পি কে) প্রচুর টাকা পেতেন, ওরা ত্যাগ স্বীকার করতে পারলে, ফুটবলাররা পারলনা কেন?"

সুরজিতের জবাব: "পি কে ব্যানার্জি দু'বছর পর কলকাতার ক্লাব কোচ হতে পারবেন। এশিয়ান গেমসে মোটামুটি ভাল রেজাল্ট হলেই তাঁর দর দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এবং তারপর আরো দশ বছর তিনি টাকা পাবেন। কিন্তু গৌতম, সুব্রত, প্রসূন বা আকবরের ক্ষেত্রে কি তা ঘটবে? তিরাশি সালে এদের মধ্যে ক'জন বড় ক্লাব থেকে আর্থিক সুবিধা পাবার অবস্থায় থাকবে? এই দুটো বছরের ক্ষতি কোচেরা পুষিয়ে নিতে পারবেন, ফুটবলাররা পারবেনা।"

ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি, ভবিষ্যতে পুষিয়ে নেবার কথা পি কে এখন ভাবছেননা। কিন্তু ফুটবলাররা যদি নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভেবে থাকে, সেটাওতো উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

## এ আই এফ এফ: ভুল

এ আই এফ এফ-এর দিক থেকেও কিছু মারাত্মক ভুল করা হয়েছে। অশোক ঘোষের আন্তরিকতা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এই প্রশ্নও না উঠে পারেনা, কটকের সভার আগে কলকাতার তিন বড়



মনোরঞ্জন এবং ভাস্কর

ক্লাবের সঙ্গে এব্যাপারে একটি ঘরোয়া সভায় তিনি বসলেন না কেন? আলোচনায় বসলে, আমরা বিশ্বাস করি, সব ক্লাবই সহযোগিতার হাত বাড়াতেন। ক্যাম্পে ভুল বোঝাবুঝির প্রশ্নই আসতনা। দ্বিতীয়ত, এবছর মাঝে মাঝে ক্যাম্প এবং বিভিন্ন টুর্নামেন্টে ক্লাবের পক্ষে ফুটবলারদের খেলতে দেওয়ার পর বিরাশির জানুয়ারী থেকে চূড়ান্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন ক্যাম্প বসালে কী ক্ষতি ছিল? ফুটবলাররা এক বছরের (বিরাশি) জন্য সম্পূর্ণ ত্যাগ স্বীকারে খুশিমনেই রাজি হত। এবং তৃতীয়ত, ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসার ব্যাপারটা ফুটবলারদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হল কেন? কটকেই এ আই এফ এফ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যে-খেলোয়াড় অনুমতি ছাড়া ক্যাম্প ছাড়বে বা ডাক পেয়েও ক্যাম্পে আসবে না—তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হঠাৎ ফুটবলারদের বলা হল কেন, একটি বিশেষ ঘোষণাপত্রে সই করলেই ক্যাম্প থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে? সোজা কথা, ফুটবলারদের এমন ভুলের দিকে ঠেলে দেওয়া হল কেন? এ আই এফ এফ মহলের খবর, কিছু ফুটবলার প্র্যাকটিসের সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি করছিল এবং ইচ্ছা করে প্র্যাকটিসে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। শাস্তির ভয় থাকলে ওরা কেউই ক্যাম্প ছাড়ত না, আবার ওদের রাখলে ক্যাম্পে সুস্থ আবহাওয়া থাকত না। তাই এইসব অনিচ্ছুক ফুটবলারদের ক্যাম্প ছাড়ার রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। টেকনিকাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু রকমের ফর্ম তৈরি হয়। একটি থেকে যাওয়ার, আর একটি চলে যাওয়ার। এই ব্যাপারটি মাথায় ঢোকা সত্যিই কঠিন। যদি কেউ প্র্যাকটিসে অশালীন আচরণ করে থাকে তাকে ক্যাম্পে রেখেই একমাসের জন্য সহজেই সাসপেণ্ড করা যেত। ভালভাবে প্র্যাকটিস না করলে প্র্যাকটিসেরও সুযোগ পাবেনা, ক্যাম্প থেকে ছাড়াতো পাবেইনা—এইরকম মনোভাব নিলে কী ক্ষতি ছিল? যদি কোনো ফুটবলার ক্যাম্প ছাড়ার কথা ভেবেই প্র্যাকটিসে অস্বাভাবিক আচরণ করে, তাকে এই কথা বলে দেওয়াইতো যথেষ্ট ছিল যে তার একূল-ওকূল দুকূলই যাবে—ভারতীয় দলেও সুযোগ পাবেনা, ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য ক্যাম্প থেকেও ছাড়া পাবেনা।

## ধীরেন দে-র চালাকি

মোহনবাগানের অভিজাত সাধারণ সম্পাদক ধীরেন দে এক ঢিলে দুই নয়—তিনটি পাখি মারার এক অভূতপূর্ব চেষ্টা করেছেন। এক, কিছু ফুটবলারের উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ মিটিয়েছেন। দুই, যার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় তিনি শঙ্কিতও সেই শৈলেন মান্নাকে কোণঠাসা করেছেন এবং তিন, দেশ এবং দশের কাছে দেশপ্রেমিক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। দেশপ্রেমিক ধীরেন দের কাছে আমাদের তরফ থেকে শুধু দুটি জিজ্ঞাসা—এক, উনিশশো সাতাত্তরের আগা খাঁ গোল্ড কাপ (ঢাকা) এবং আরো নানা টুর্নামেন্টে তাঁর ক্লাব ভারতের স্বার্থে খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেয়নি কেন? এবং দুই, তাঁর বক্তব্য তিনি আগেভাগেই জানিয়ে দেননি কেন? ফুটবলাররা ক্যাম্প ছাড়ার আগেই সেই সম্ভাবনার খবর তিনি বিশ্বস্তসূত্রে পেয়েছিলেন। সে প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। তাহলে মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) সকালেই ক্যাম্পে থাকা আটজন মোহনবাগান ফুটবলারকে তিনি জানিয়ে দিলেন না কেন যে ক্যাম্প ছাড়লে মোহনবাগান তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে? গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই কিন্তু ছুরি শানিয়ে অপেক্ষায় থাকার একটা কটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

## সেই যতীন চক্রবর্তী

আর আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। খবরের মধ্যে থাকার এবং নিজেই খবর হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় তিনি রাজনারায়ণকেও হার মানাতে পারেন। কখনোই ভুলতে পারেন না, তিনি মাননীয় পূর্তমন্ত্রী। এবং তাই, প্রেস বক্সে ঢুকে অকারণ মাতব্বরি করেন। আর এবারতো বলেই ফেললেন, তিনি দেখবেন দু'চারজন ফুটবলারকে দেওয়া সরকারী ফ্ল্যাট বা জমি কেড়ে নেওয়া যায় কিনা। পাঞ্জাব সরকার খেলোয়াড়দের মাঝেমাঝে জমি দেয়, রাজস্থান এবং কর্ণাটক সরকারও শ্রীরাম সিং এবং প্রকাশ পাড়ুকোনের ক্ষেত্রে তা করেছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় তেমন ঘটনা এখনো ঘটেনি। যতীনবাবু বা পূর্তমন্ত্রক কি কোনো ফুটবলারকে ফ্ল্যাট বা জমি দান করেছেন?



গৌতম, অমলরাজ এবং মনেস

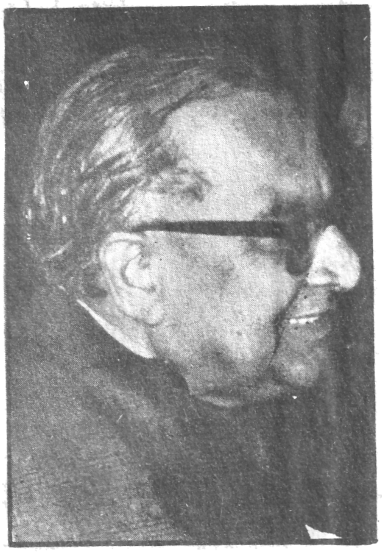
পুরো দামের বিনিময়ে কেউ যদি ফ্ল্যাট বা জমি নিয়ে থাকেন, তা ফিরিয়ে নেবার কথা একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী কীভাবে বলেন?

## দেশদ্রোহী

ফুটবলারদের আচরণের সমালোচনা হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আনন্দবাজারের স্পোর্টস রিপোর্টার একুশজনকে সরাসরি 'দেশদ্রোহী' বানিয়ে দিলেন। জিওফ বয়কট একাধিকবার ইংল্যাণ্ডের হয়ে টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চাননি, তাঁকে কেউ 'দেশদ্রোহী' বলেছেন বলে শুনিনি। যেহেতু ফুটবলাররা এই চুক্তিপত্রে সই করে এসেছে যে ক্যাম্প সম্পর্কে কোনো বিবৃতি দিতে পারবে না, তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অসত্য রোমহর্ষক কাহিনী ফাঁদাও বোধহয় 'নিরপেক্ষ' সাংবাদিকতার লক্ষণ নয়। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারী) রাত্রে সল্ট লেকের ক্যাম্পের আশেপাশেও কোনো সাংবাদিক হাজির ছিলেন না। তাহলে?

## এখন ক্যাম্পে

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এবং অশোক ঘোষের চেষ্টায় একুশজন ফুটবলারের ক্যাম্পে ফেরার দরজা খুলে গেছে। আশা করব, এর পর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না। আশা করি, বিশিষ্ট দৈনিকের স্পোর্টস রিপোর্টারের সেই রিপোর্ট মিথ্যা প্রমাণিত হবে—যাতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে যে, একুশজনকে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিলে পি কে ব্যানার্জি এবং অরুণ ঘোষ পদত্যাগ করবেন। আশা করব, একুশজন ফুটবলার প্রথম দিন থেকেই বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের সঙ্গে (এমন কি বিশ্বজিতের অধুনা-খ্যাত মেজদার সঙ্গেও) সহজভাবে মেলামেশা করবে। গত কয়েকদিনের স্মৃতিকে সকলেই দুঃস্বপ্নের ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলবে।



মতীন চক্রবর্তী

## প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন

কলকাতার ফুটবলারদের মনে করিয়ে দেওয়া ভাল, অ্যাসোসিয়েশন থাকলে হয়তো এত বড় ভুলের ফাঁদে ওদের জড়িয়ে পড়তে হত না। সংগঠিত থাকলে, তাদের বিরুদ্ধে এমন ঘৃণ্য অপপ্রচারও অবাধে চলতে পারত না। নানা অজুহাতে, প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন গড়ার চেষ্টা থেকে যে ফুটবলাররা নিজেদের সরিয়ে রাখতে চাইছে, ময়দানের খলনায়কেরা যথাসময়ে তাদের পিঠে ছুরি বসাতেও দ্বিধা করবে না।

## আশা

দেশপ্রেমের জোয়ারে প্লাবিত হবার পর সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এখন অনেক পলিমাটি। এই উর্বর জমিতে যথার্থই দেশপ্রেমের কিছু গাছপালা গজাবে, এই আশা করতে চাই। এবং একটি গল্প শুনিয়ে রাখতে চাই।

স্টেট ব্যাঙ্কের মেইন ব্রাঞ্চের ( স্ট্রাণ্ড রোড ) সামনে জোর এক আলোচনা চলছিল। এক ইস্টবেঙ্গল সমর্থক বলেন, "আমরা আর কিছু শুনতে চাই না, ক্লাব নয়—সবার আগে দেশ।" অতঃপর সুরজিৎ সেনগুপ্তর সঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত কথোপকথন হয়।

সুরজিৎ : 'উনিশশো তিয়াত্তরের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে কী হয়েছিল ?'

তিনি : 'কে না জানে, ইস্টবেঙ্গল পিয়ং ইয়ং ক্লাবকে ৩—১ গোলে হারিয়েছিল।'

সুরজিৎ : 'পঁচাত্তরের শীল্ড ফাইনালের রেজাল্ট কী হয়েছিল ?'

তিনি : 'এটা কোনো প্রশ্ন হল ? ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে পাঁচ গোলে হারিয়েছিল।'

সুরজিৎ : 'আচ্ছা, গত বছরের প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে ভারত আর সিঙ্গাপুরের খেলার রেজাল্ট কী হয়েছিল ?'

অতঃপর ঐ ফুটবল-অনুরাগী মাথা চুলকান এবং বলেন "জানি না !"

আশা করব, তিনি এবং তাঁর মতো দেশপ্রেমিক ক্রীড়ানুরাগীরা এবার থেকে ভারতের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ম্যাচের ফলাফল মনে রাখবেন। নাহলে, 'দেশপ্রেমে'র মতো একটি মহৎ এবং গম্ভীর শব্দও নিতান্তই জোলো হয়ে যাবে।



কে ব্যানার্জী

# আমেদ খান কলকাতায় এসে-ছিলেন

**সরোজ চক্রবর্তী** : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের 'পঞ্চ পাণ্ডব' যুগের মহানায়ক আমেদ খান বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় সাতদিনের জন্য এসেছিলেন ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে। ২২ ফেব্রুয়ারী তিনি বাঙ্গালোরে ফিরে যান। যাওয়ার আগের দিন ওঁর সঙ্গে ঘন্টাখানেক কথা হল। ফুটবলের ব্যাপারে তিনি মুখ খুলতে চান না। তবুও শিবিরত্যাগী ফুটবলারদের সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, "খেলোয়াড়রা ক্লাবের কথা একশোবার চিন্তা করবে। দেশের প্রতি ওদের যেমন দায়িত্ব আছে, ওদের প্রতিও দেশের দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ কোনোদিন কোনো ফুটবলারকে দেখেনি। ক্লাবই খেলোয়াড়দের দেখে এসেছে। আজ ওদের বিরুদ্ধে যে অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে তাকে আমি মোটেই সমর্থন করি না। যদি খেলোয়াড়রা জানত তাদের পা ভেঙে গেলে, বাড়িতে মা-বাবার অসুখ হলে অথবা বোনেদের বিয়ে দিতে হলে 'দেশ' এগিয়ে এসে সাহায্য করবে, তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা ক্যাম্প ছেড়ে কিছুতেই আসত না। মোহনবাগান ক্লাব নিজেদের বাঁচানোর জন্য সব দোষ খেলোয়াড়দের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। ক্লাবের এই মনোভাব ভবিষ্যতে ক্লাবের ক্ষতি ডেকে আনবে।"

আমেদ খান কলকাতায় এসে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একজন কর্মকর্তার বাড়িতে উঠেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গল্পও করে এসেছেন। বললেন, "অনেক বছর পরে কলকাতায় এলাম। আসব আসব করেও এতদিন সময় হচ্ছিল না। এসে দেখলাম, এখানে অনেক কিছুই পাল্টেছে। জ্যোতিষদাকে দেখে এসেছি। জ্যোতিষদার অবস্থা দেখে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ওঁর জন্য হয়ত আর একবার আমাকে কলকাতায় আসতে হবে। ওই মানুষটার কাছে আমি অনেক ঋণী। জ্যোতিষদা (জে সি গুহ) দুঃখ করে বলছিলেন, আজকাল কেউ তাঁর খোঁজ নিতে আসে না।"

আমেদ খান নিঃশব্দে কলকাতায় এলেন, আবার সেইভাবেই চলে গেলেন বাঙ্গালোরে। বড় বড় দৈনিক কাগজগুলো বাজার গরম করার জন্য অনেকের কাছেই ছুটেছেন শিবিরত্যাগী ফুটবলারদের শায়েস্তার অভিপ্রায়ে। কিন্তু যে মানুষটা সাতদিন কলকাতায় থেকে গেলেন, তাঁর কাছে একমুহূর্তের জন্যও কেউ গিয়ে জানতে চাইলেন না, 'কেমন আছেন আমেদ খান ?'

# ফিলিপ-অমলরাজ কি ইস্টবেঙ্গলে যাচ্ছে?

/ সরোজ চক্রবর্তী

১৭ ফেব্রুয়ারী। রাত্রি দশটা বেজে গেছে তখন। করুণাময়ী হাউসিং এস্টেটে এ আই এফ এফ ক্যাম্পে সই করার উত্তেজনা চলছিল বাংলার ফুটবলারদের ঘিরে। চিত্রটা যেন দলবদলের মতো। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে ফুটবলার তোলার জন্য। প্রেমনাথ ফিলিপ, অমলরাজ, সি ভি ফ্রান্সিস (কেরালা), ফরিদ (অন্ধ্র) সই করে ফিরে এল একটা অ্যামবাস্যাডার গাড়ীর কাছে। সঙ্গে ছিল কয়েকজন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লোক। ওরা হাতে ধরে গাড়ীতে তুলে দিল ফিলিপদের। সবার চোখের সাম দিয়ে দৃশ্যটা ঘটে গেল। গাড়ী ছুটে চলল শহরের দিকে।

পরের দিন সকালে ক্যাম্পে পৌছতেই খবরটা দিলেন জনৈক কেয়ারটেকার। সেইদিন সকাল থেকেই তিন প্রধানের কর্মকর্তারা মাঠ আর ক্যাম্প করেছেন। বিকেলের প্র্যাকটিসের সময় ব্যাপারটা প্রথমে আঁচ পেল প্রশান্ত ব্যানার্জি। মহমেডানের তিনজন কর্মকর্তা মাঠে উপস্থিত ছিলেন। প্রশান্ত ওদের গোচরে আনল ঘটনাটাকে। বলল, 'আপনারা এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? যান, গিয়ে কথা বলুন ফিলিপ-অমলরাজের সঙ্গে।' একজন কর্মকর্তা আমতা আমতা করে বললেন, 'আমরা তো কথা বলেছি। কিন্তু ওদের হাবভাব আমাদের ভালো লাগছে না। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব হয়ত প্রচুর টাকা দিচ্ছে। বোধহয়, ওদের আর ধরে রাখতে পারব না।' প্রশান্ত রেগে গেল, 'তাহলে কি আপনারা ভালো টীম করতে চান না?' 'নিশ্চয় চাই, কিন্তু ওরা যদি মহমেডানে থাকতে না চায় তাহলে জোর করে রাখব কেমন করে?' আবার দ্বিতীয় কর্মকর্তা উত্তর দিলেন।

প্র্যাকটিস সেরে ক্যাম্পে ফিরে এসে মহমেডানের সেই তিনজন কর্মকর্তা সোজা চলে গেলেন কোচ হাকিমের ঘরে। প্রশান্ত নিজে উদ্যোগ নিয়ে ফিলিপ-অমলরাজের সঙ্গে কথা বলল। ওদের দুজনেরই বক্তব্য—'মহমেডান ক্লাব আমাদের সাথে কথা বলেনি।' অমলরাজের দাদা জন নাকি তাঁর ভাইয়ের দলবদলকে সমর্থন করছেন। এক টেলিগ্রামে তিনি সেই মতামত ভাইকে জানিয়েও দিয়েছেন।

কেরালা থেকে সি ভি ফ্রান্সিসের দাদা টেলিগ্রাম করে ভাইকে জানিয়ে দিলেন, 'ইস্টবেঙ্গলে খেললে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এক লাখ টাকা চাইবে।' ১৩ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যেবেলায় আমি পি কে ব্যানার্জির সঙ্গে অন্য এক বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। রাত্রি ন'টা পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। প্রাক্তন রেলওয়ে ফুটবলার, ভাগিসকে দেখলাম সি ভি ফ্রান্সিস এবং ফরিদের সাথে আড়ালে কথা বলতে। প্রতিদিন সন্ধ্যের পরে ক্যাম্পের ধারেকাছে খেলোয়াড়রা ঘুরে বেড়াত। সেই সময়ই খেলোয়াড়-ধরারা গোপন কথা সেরে ফেলতেন। ওইদিন আরো তিন-চারজন ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়দের সাথে ভাগিস অনেকক্ষণ গোপনকথা বললেন। সঙ্গে ছিল ইস্টবেঙ্গলের দুজন লোক। ক্যাম্পের একজন কেয়ারটেকার (নাম বলতে বারণ আছে) বললেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ভাগিসকে কাজে লাগিয়েছেন ভিন রাজ্যের প্লেয়ারদের সাথে কথা বলার জন্য। ক্যাম্প থেকে যারা বাদ পড়বে সম্ভাব্য এমন কয়েকজনের পিছনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম থেকেই লেগে রয়েছে।'

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক প্রশান্ত ঘোষ ২০ ফেব্রুয়ারী তাঁর অফিসে বসে বললেন, 'হ্যাঁ আমরা সেরকম একটা চিন্তা নিয়ে কাজে



নেমেছিলাম। বাইরের যে-সব প্লেয়ার বাদ পড়বে তাদের থেকেই কয়েকজনকে টীমে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল ঠিকই। কিন্তু আমরা ভাগিসকে কাজে লাগাইনি। আমি 'ভাগিস' নামে কাউকে চিনিও না।'

— সি ভি ফ্রান্সিস, ফরিদের সঙ্গে তাহলে যোগাযোগ করলেন কীভাবে?

— 'আমাদের লোকেরাই ওদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু এখনো পাকা কথা হয়নি। ওদের দুজনের ব্যক্তিগত কিছু অসুবিধে রয়েছে। আমরা ওদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি।'

প্রশান্ত ঘোষ একই সঙ্গে ফিলিপ-অমলরাজের ইস্টবেঙ্গল ক্যাম্পে আটকা থাকার খবরটাকে অস্বীকার করে বললেন, 'তবে আমরা ভালো টীম করছিই।'

— অভিযোগ উঠেছে আপনারা ক্যাম্পে গিয়ে খেলোয়াড়দের নানা প্রলোভন দেখিয়েছেন?

— 'সম্পূর্ণ মিথ্যে খবর। ক্যাম্প ভাঙার জন্য আমরা কখনো কোনো চেষ্টা করিনি। আমরা সবসময় সেকেন্ড টীমের দিকে নজর দিয়েছি। তাছাড়া আমাদের টীমে তিন ইরানী যখন আছেই তখন আমাদের চিন্তা কীসের? আজ খেলোয়াড়দের নিয়ে যে ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ এ আই এফ এফ এবং খেলোয়াড়দের ব্যাপার। আমরা কখনোই খেলোয়াড়দের উস্কানী দেওয়ার আগ্রহ দেখাই নি। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তার ঐতিহ্য নিয়ে টীম করছে এবং করবে। আমাদের টীমে শুধু মিড-ফিল্ডের অভাব রয়েছে। আমরা কেন ২১ জন খেলোয়াড়কে প্রলোভন দেখাতে যাবো বলতে পারেন? আজ এ আই এফ এফ তাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য ক্লাবগুলোর ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। এবং আমি মনে করি, কাগজগুলো এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করছে।'

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিছু তরুণ খেলোয়াড় নিচ্ছে। রেলের অরুণ দাস, সুব্রত অধিকারী, স্বপন নন্দী, কার্তিক শেঠ, শিবনাথ বাড়ুই, শংকর অধিকারী এর মধ্যে কয়েকজন সম্ভবত লাল-হলুদের জার্সি পরবে এই বছরে।

প্রশান্ত ঘোষ জানালেন, 'সত্যজিৎ, সমর, দিলীপ পাল কথা দিয়েছে।' ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মইদুলের সঙ্গেও কথা বলেছিল। সমরের কানে এই খবর পৌছনোর সঙ্গে সঙ্গে মইদুলের ব্যাপারটা ইতি ঘটে। তিন ইরানী নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কোনো চিন্তা করছে না। ইতিমধ্যে, এক ঘরোয়া বৈঠকে কর্মকর্তারা স্থির করেছেন, যারা ক্লাব ছেড়ে চলে গেছে তাদের এখনই ফিরিয়ে আনার কোনো চেষ্টা করা হবে না।

তবে, দলবদলের আসরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কোমর বেঁধে নেমেছে প্রথম থেকে। আর কয়েকদিন অপেক্ষা করলেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। গত বছর ক্লাবের যে ভোগান্তি হয়েছে, সেই কথা চিন্তা করে কর্মকর্তারা পাকা কাজ করছেন। যদি ফিলিপ অমলরাজ, সি ভি ফ্রান্সিস এবং উঠতি লিংকম্যান ফরিদ টীমে আসে তাহলে নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গল শক্তিশালী হবে। কোচ নিয়েও সমস্যায় পড়েছে। কোচ আমেদকে রাখবেন কিনা, সেটাও ভাবছেন ওরা। ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টার রেখে খেলোয়াড়দের ওপর সব ছেড়ে দিলে ইস্টবেঙ্গল টীম

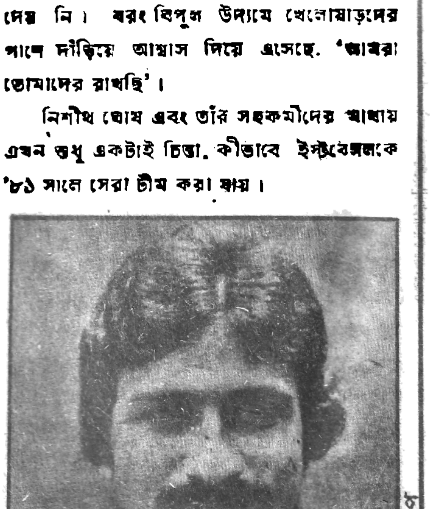
কতটা সফল হবে। সে বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ আছে।

পুনশ্চ: লেখা প্রেসে পাঠানোর পরও আমাদের হাতে আরো কিছু খবর এসে পৌছল। সেই খবর দৈনিক কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত (১ মার্চ 'খেলার কাগজ' বেরোনোর আগে) হয়েও যেতে পারে। নিশীথ ঘোষ তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকেদের জানিয়েছেন, মনোরঞ্জন, সমর, দিলীপ পাল ও ম্যাথুজকে কোন তিরস্কার বা বহিষ্কার করবেন না। হাবিবকে ইস্টবেঙ্গল রাখছে না, সেটা প্রায় স্থির হয়ে গেছে।

সত্যজিৎ-এর সঙ্গে মহমেডান ক্লাব অনেক দূর কথা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সত্যজিৎও মনে মনে ইস্টবেঙ্গল টীম ছাড়ার কথা স্থির করে নিয়েছিল। কিন্তু মহমেডানের একজন খেলোয়াড় শেষপর্বে সত্যজিতকে নেবার সিদ্ধান্তে বাধা দেয়। ফলে মহমেডান এখন ওকে 'নেবে না' জানিয়ে দিয়েছে।

খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে মোহনবাগান ক্লাব যে মনোভাব দেখিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিয়েছে। এবং 'আনন্দবাজারে' নিশীথ ঘোষের বিবৃতিকে বিকৃত করে ছাপা হয়েছে বলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মনে করছে। টীম করার ব্যাপারে ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব কারোর হুমকিকে ভয় করবে না, এই মর্মে এক বক্তব্য রেখে অনেক কর্মকর্তা বলেছেন, "মোহনবাগান ক্লাবের টাকা নেই বলেই ওরা 'আট ফুটবলারকে' নেবে না জানিয়েছে। আসলে কোনো 'দেশপ্রেম' নয়। আমরা ভাল টীম করবই। খেলোয়াড়দের বিপদের দিনে মোহনবাগান ক্লাবের মতো হবেনা। আমাদের ক্লাবের হয়ে অনেক বছর ধরে সার্ভিস দিয়ে গেল যারা, তাদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে আমরা মেকী দেশপ্রেমী হতে রাজী নই।" ইস্ট-বেঙ্গল ক্লাব টীম গড়ার কাজে মোটেই ভাটা দেয় নি। বরং বিপুল উদ্যমে খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বাস দিয়ে এসেছে, 'আমরা তোমাদের রাখছি'।

নিশীথ ঘোষ এবং তাঁর সহকর্মীদের মাথায় এখন শুধু একটাই চিন্তা, কীভাবে ইস্টবেঙ্গলকে '৮১ সালে সেরা টীম করা যায়।



দিলীপ

# রেলদলের অধিনায়ক / মনীশ মৌলিক

কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার অসীম কৃপায় চল্লিশ মিনিটের পথ প্রায় দেড় ঘণ্টায় অতিক্রম করে যখন পূর্ব পুঁটিয়ারীতে জাতীয় রেলদলের অধিনায়কের বাড়ী পৌছলাম, তখন বলাই চক্রবর্তী বাড়ীতে নেই। হোমফ্রন্টের বিশ্বস্ত-সূত্র অনুযায়ী, আড্ডা দিতে গেছে। কখন ফিরবে বলা মুশকিল। গার্হস্থ্য অনুরোধ এল, আপনি বসুন। ওকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি। নিজে বাঙালী হয়ে আড্ডার মর্ম বুঝব না, এমন হয় না। তবু আড্ডা থেকে তাকে বঞ্চিত করার মৌন সম্মতি জানিয়ে ঘরে বসলাম এবং মিনিটখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, সমর্থ একটি যুবক সাইকেল নিয়ে বেরোচ্ছে। তার মুখ দেখে মনে হল, পুলিশের খোদ বড়কর্তা যেন তাকে বলেছেন, এই অপরাধী ধরে আনতে পারলেই 'বীরচক্র' পাওয়া যাবে। বড্ড দুঃখ হচ্ছিল বলাইয়ের জন্য। কিন্তু কোন উপায় নেই। ভ্রু কোঁচকানো সম্পাদকের চেহারাটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না।

বলাইয়ের নিজের ঘরে বসে একা একা যখন মনে মনে পরিবহন মন্ত্রী থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার পর্যন্ত সি এস টি সির প্রত্যেকের চোদ্দপুরুষান্ত করছি, ঘরে ঢুকলেন বলাইয়ের বাবা। উদ্দেশ্য—সম্ভবত আগন্তুক (অতিথি) সৎকারের তদারকী। সন্তুতির আগুনে বিষয় 'ক্যাম্প ও কেলেঙ্কারী' নিয়ে আলোচনা স্বভা-বতই শুরু হল। কিন্তু কৌতুহল টিকল না। কারণ সুদৃশ্য কাপে চা ভদ্রচ্ছলে এসে গেছে। চক্রবর্তীমশাই পূর্ববাংলার খাদ্যের ও 'সত্তা' বস্তুতে কি বোঝায় এমন উদাহরণ রাখতে কিছু খাদ্যসংক্রান্ত গল্প বললেন। কেটে গেল আরও আধঘন্টা।

পৌনে নটা নাগাদ বলাই এলেন। বললাম, আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার প্রয়োজন। ন্যাশনালে রানার্স রেলদলের অধিনায়ক সম্পর্কে অনেকেই খোঁজখবর পেতে চান। বলাই ঠোঁট টিপে হাসল।

—ন্যাশনালে আপনারাই চ্যাম্পিয়ন হতে পারতেন বলে অনেকের ধারণা। হেরে যাওয়ার কারণ কি?

— বলব ফিনিশ করার মত লোকের অভাব ছিল। টীম যে সমস্ত মুভ করেছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে ফাইনালে রেলের ২—০ গোলে ম্যাচ জেতা উচিত ছিল। কিন্তু ঐ একটা দোষে মার খেলাম আমরা। আরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু সেগুলোকে এর মতো জরুরী বলে মনে হয় না।

— পাঞ্জাব জয়ী হওয়ার পর বলেছে যে, রেলদল তো বাংলাদলেরই দ্বিতীয় সংস্করণ। আপনারও কি তাই মনে হয়?



প্রদীপ ব্যানার্জী ও বলাই চক্রবর্তী

—দ্বিতীয় সংস্করণ বলে ভাবার মত কিছু নেই। বাংলা কংগেই বাংলা দল এবারে নানা কারণে দুর্বল ছিল। তবুও যা ছিল, তাতে বাংলাকে হারিয়ে দিতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তার মানে এই নয় যে, রেলদল কোনও অংশে খারাপ ছিল। তবে প্রদীপ ব্যানার্জির কথাটা অতি সত্য বলে আমাদের মনে হয়েছে। প্রদীপদা বলেছিলেন, বাঘ এখন দুর্বল। "এই সুযোগ। যা কিছু করার এখনই করতে হবে। এ সুযোগ হারালে চলবে না। দ্বিতীয় সংস্করণ-ফংস্করণ বাজে কথা। এবারে প্রদীপদার হাতে গড়া রেলদল জাতীয় আসরে এককভাবে অনন্য ছিল।

—কোচ অরুণ ঘোষকে আপনি খুব কাছে পেয়েছেন। বস্তুত, অরুণবাবুর কাছে আপনি অনেক কিছু শিখেছেন। প্রদীপ ব্যানার্জিকেও তো খুব কাছ থেকে দেখলেন। দুই কোচের মধ্যে তফাৎটা কি?

বিপদগ্রস্তের মত হাসলেন বলাই। তারপর নিজস্ব ভাব-ভঙ্গীতে প্রতি মুহূর্তে সংকোচের চিহ্ন ফুটিয়ে বললেন, 'কি বলব বলুন তো? প্রশ্নটা আমার উদ্দেশ্যে করা মনে হলেও আসলে ওটা ছিল স্বগতোক্তি।

—দুজনের মধ্যে কাউকেই আমি খাটো করতে রাজী নই। একটা খেলোয়াড়ের সঙ্গে প্রদীপদা যখন যেমন তখন তেমন রীতি অবলম্বন করে চলেন। আর অরুণদা সর্বদাই ধীর, স্থির, গম্ভীর। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে, প্রতিটি প্লেয়ারের শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে দলের প্রয়োজনে লাগানোর ব্যাপারে প্রদীপদার কোন জুড়ি নেই।

— ক্যাম্পে তো অনেককেই ডাকা হয়েছে। কটকে নিজস্ব পারফরমেন্সে আপনার কি মনে হয় না, ক্যাম্পে আপনারও ডাক পাওয়া উচিৎ ছিল?

— সে আপনারা বুঝবেন, আপনারা লিখবেন। নিজে বললে সবাই ভাববে, নিজের ঢাকটা নিজেই পেটাচ্ছে। অথচ আমি বুক বাজিয়ে বলতে পারি, ক্যাম্পে ডাক পাওয়ার মত যোগ্যতা আমার ছিল। আমার চেয়ে অনেক বাজে খেলোয়াড়ও ক্যাম্পে ডাক পেয়েছে।

—বড়ো ক্লাবে আপনি খুব কমই খেলেছেন। ১৯৭৬-'৭৭এ ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছাড়া আর কোন বড় ক্লাবে আপনি খেলেননি। আপনি ইস্ট বেঙ্গল ছাড়লেন কেন?

—কারণটা আমার কাছে আজও অজ্ঞাত। দুটি বছর আমার পেছনে ঘুরে ঘুরে ক্লাব আমাকে '৭৬ সালে পেয়ে গেল। '৭৬-'৭৭এ এমন কোন বাজে পারফরমেন্স করিনি যাতে ক্লাবের ক্ষুব্ধতার কারণ ঘটতে পারে। পূর্ববঙ্গেই আমার দেশ। কাজেই ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আমার ও আমাদের আত্মিক সম্পর্ক বহুদিনের। আমি কখনও ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে চাইনি। ঠিক এই কারণেই তখনকার মরশুমের ছাড়পত্রে সই করার শেষদিন অবধি আমি অপেক্ষা করেছিলাম। তখন ক্ষমতায় আসীন নিশীথবাবুর দলবল আমাকে কথা দিয়েও শেষ অবধি নিজেদের কথা রাখেন নি। আজও বুঝতে পারিনি, আমাকে কথা দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল।

—অন্য কোন বড় দল আপনাকে কখনও ডাকে নি?

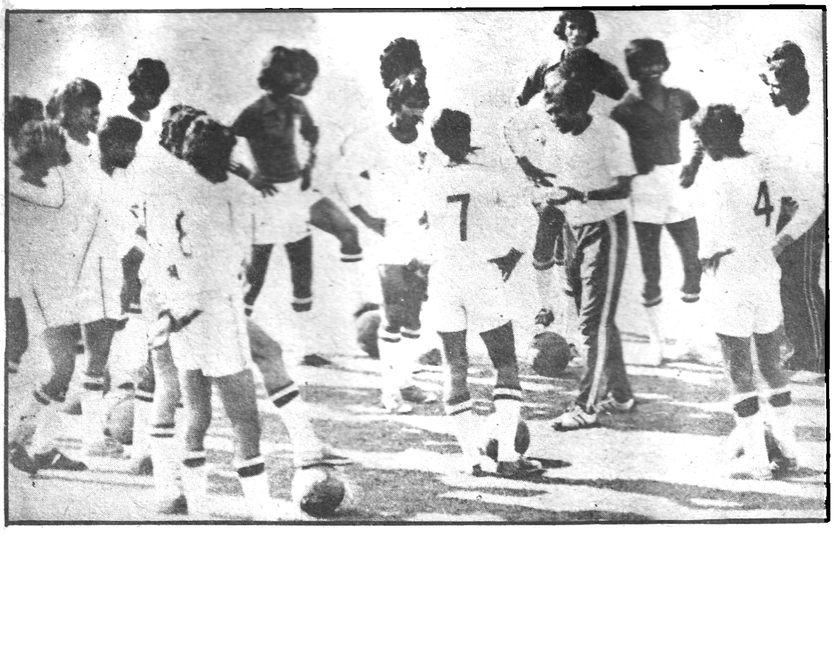
— না. কখনও সেরকম ডাক পাইনি।

— ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে?

তিনদফা হাসি সমন্বিত ইন্টারভিউয়ের এটি ছিল শেষ দফা। ক্লান্ত হাসি। বেদনার ছোঁয়া লাগা। প্রাণহীন নিরুত্তাপ গলায় বললেন, যদি পাই, যাব। খেলব।

নিষ্প্রাণ স্বর আমাকে কিছুটা ব্যাথিত করেছে। কলকাতা মাঠে বলাই কি এতই মূল্য হীন ছিলেন? হয়ত না। তবু অদৃষ্টের পরিহাস বলে একটা কথা আছে। বলাই তার শিকার। নিজস্ব আত্মবিশ্বাস থাকলেও পরিবেশ তাকে মেনে নেয়নি। তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। বলাই, আপনি দুঃখিত হবেন না। ময়দানের আনাচে-কানাচে এমন অনেক অনেক কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তারা কিন্তু একেবারে হারিয়ে যাননি। আপনিও হারাবেন না। ছোট দলে খেললেও '৮০ সালের জাতীয় রেল দলের অধিনায়কের নাম খুব সহজেই লোকে ভুলে যাবে, একথাটা একেবারেই ভুল।

পুনশ্চ: আমি জানি, অনেকেই মনে মনে প্রশ্ন কেঁদে ফেলেছেন, এ কী ব্যাপার, বলাই চক্রবর্তীর জীবনের স্মরণীয়তম দুটি ম্যাচের কথা একবারও তোলা হয়নি কেন? বুদ্ধিমান এবং স্মরণশীল পাঠক—কারণ একটাই। ঐ দুটি ম্যাচের কথা আপনারা সকলেই জানেন। ছিয়াত্তরে রাশিয়ার পাকতাকোরের বিরুদ্ধে বলাই এর খেলা গ্যালারিকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে ওকে কেউ কেউ আদর করে নাম দেন রাশিয়ান চক্রবর্তী। সাতাত্তরের ৯ জুলাই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের জয়কে নিশ্চিত করার ব্যাপারেও বলাইয়ের ভূমিকা কম ছিল না। রমেন ভট্টাচার্যর বদলে মাঠে নেমে বলাই সেদিন মোহনবাগানের সব আক্রমণকে চূর্ণ করেছিল। অবশ্যই পাশে ছিলেন ঠাণ্ডা মাথার শ্যামল ঘোষ।



# দেশ বিদেশের টুকরো খবর

## ক্লার্কের শাস্তি:

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার সিলভেস্টার ক্লার্ককে তিনটে ম্যাচের জন্য সাসপেণ্ড করা হয়েছে। গত মাসে পাকিস্তানের মুলতানে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টে দর্শকদের উদ্দেশ্যে ইট ছোঁড়ার জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে ক্লার্ককে এ শাস্তি দেওয়া হয়। সেন্ট ভিনসেন্টে অনুষ্ঠিত একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ, প্রথম টেস্ট এবং শেল শীল্ডের একটি খেলায় ক্লার্ক অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

## মরুভূমিতে ক্রিকেট:

আগামী মার্চ মাসের পাঁচ এবং ছয় তারিখে আরবের গলফে দুটি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইংল্যাণ্ড ফুটবল দলের প্রাক্তন ম্যানেজার ডন রেভি এবং পাকিস্তানী ক্রিকেট তারকা ইউনিস আহমেদের ব্যবস্থাপনায় ১১ জন ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটার এ খেলায় অংশ গ্রহণ করার সম্মতি জানিয়েছেন। ভারত ও পাকিস্তানের কিছু ক্রিকেটার বিপক্ষ দলে খেলবেন। ইংল্যাণ্ডের হয়ে যাঁরা খেলবেন: মাইক ডেনেস, গ্রাহাম রুপ, কিথ ফ্লেচার, প্যাট পোকক, জিওফ আরনল্ড, ফ্র্যাঙ্ক হেস, ডেভিড লয়েড, এ্যালান বুচার, জন স্নো, জন লিভার এবং বেসিল ডি' ওলিভিয়েরা। বিপক্ষ দলে যাঁরা খেলবেন: বিষেণ সিং বেদী, মদনলাল, ইমরান খান, জাহির আব্বাস, ওয়াসিম রাজা, ওয়াসিম বারি এবং নাজির জুনিয়র। সোবার্স এবং কানহাই দ্বিতীয় খেলায় ইংলণ্ডের হয়ে মাঠে নামবেন।

## ব্যারী রিচার্ডসের ইচ্ছে:

টেস্ট ক্রিকেটে নিজেকে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে না পারায় ব্যারী রিচার্ডস অবসর গ্রহণের কথা জানিয়েছেন। বর্তমানে রিচার্ডস ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান ডিস্ট্রিক্ট কম্পিটিশন' প্রতিযোগিতায় মিডল্যাণ্ড গিলডফোর্ডের হয়ে খেলছেন। আগামী মাসে রিচার্ডস প্রেমিকা অ্যানে হ্যারিসকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করবেন। এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে এরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবেন। কোচিং এবং টি ভি কমেন্টেটার হিসেবে রিচার্ডসকে পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যাবে।

—দেবাশিস দত্ত

# ক্ষমা করবেন না

**ধীমান দত্ত**

২০ ফেব্রুয়ারী রাতে যখন প্রথম খবরটা পেলাম, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। চোখের সামনে ভেসে ওঠা আমার কল্পনার দৃশ্যপটে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম আটটা করুণ মুখ। চারদিক থেকে ছুঁড়ে দেওয়া অসংখ্য অপবাদের বিষাক্ত তীরের আঘাতে ওরা জর্জরিত। দুঃখ এবং বেদনার বেড়াজালে বন্দী হয়ে ওরা বেরিয়ে আসার পথ খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে। যন্ত্রণার কাতরতায় কুঁচকে ওঠা মুখের প্রতিটি রেখায় যেন একইসঙ্গে অভিমান আর বিদ্রোহের অভিব্যক্তি। ওদের ওপর এই অবিচারের বিরুদ্ধে ওরা যেন অনেক কথা বলতে চাইছে কিন্তু কেউ শুনতে চাইছে না। জোর করে গলা টিপে আটকে রাখছে। ব্যথার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে আক্রমণের ঢেউগুলো থেকে বাঁচার তাগিদে ওরা যে দেওয়ালে পিঠ রেখেছিল, সেখান থেকে আরও বড় আক্রমণের ধাক্কা ওদের মুখ থুবড়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইছে। পায়ের তলা থেকে মাটিও যেন আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। ওদের বাঁচানোর জন্য কেউ নেই। ওদের চোখের কোন থেকে গড়িয়ে পড়ছে কয়েক ফোঁটা জল, ওদের চোখের মণি থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে আগুন।

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎঝলকে যেমন চারপাশটা এক লহমার জন্য দেখা যায়, কিন্তু তারপরই আবার মিলিয়ে যায়, দৃশ্যটাও আমার চোখের সামনে থেকে ঠিক সেইভাবেই হারিয়ে গেল। বদলে ওদের আটজনের পুরনো কিছু টুকরো কথা কানের পর্দায় পর পর আঘাত করে গেল। "ক্লাব না তাড়ালে, কোনদিনও অন্য ক্লাবে যাব না।" — "এই ক্লাবের সঙ্গে আমার যেন একটা ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।" — "এই ক্লাবকে নিজের মায়ের মতো সম্মান দিই।" — "এই ক্লাব ছাড়ার কথা মনে আনাই কঠিন।" — "এই ক্লাব..."। আর শুনতে পেলাম না। আমার বিবেক কি ভীষণ কঠিন স্বরে বলল, "পারো না, এইসব বিশ্বাসঘাতকদের মুখোশ খুলে দিতে? এই স্বার্থান্বেষী মহলের পরিচয়টা সকলের সামনে পরিষ্কার করে দিতে? ঐ আটজনের চোখের জলের মূল্য দিতে?...।"

প্রিয় পাঠক, আমার ক্ষমতা কতটুকু? বড় জোর আমার কলমের ডগা থেকে কিছু ধিক্কার-বাণী এদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে কিছুটা প্রতিবাদ হয়তো করা যায়, কিন্তু তাতে কী আসে যায়? এরা এত বেশী ক্ষমতাবান যে, শিক্ষার ইচ্ছে বা লজ্জার প্রলেপ অনেকদিন আগেই এরা পেছনে ফেলে এসেছেন। জানি, এরা যথারীতি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবেন। প্লেয়ারদের "দেশদ্রোহী" আখ্যা দিয়ে "তথাকথিত দেশপ্রেমিক" সেজে ঠিকইনাম কিনে যাবেন। তবে একটাই প্রার্থনা। আপনাদের ঘৃণা যেন এদের ওপর শ্রাবনের বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে।

১৭ ফেব্রুয়ারী রাতে সল্ট লেকের করুণাময়ী হাউসিং এস্টেটে যে ঘটনা ঘটেছে, তা আর নতুন করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। সকলেই জানেন, ঐ রাতে একুশজন ফুটবলার ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে। এইসব ফুটবলাররা কোন অবস্থার মধ্যে এবং কেন ক্যাম্প ছাড়তে বাধ্য হয়েছে, এবং এদের 'দেশদ্রোহী' হিসেবে অভিহিত করে যেভাবে জল ঘোলা করা হয়েছে, তা কতদূর সংগত—এ নিয়ে হাজার প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু প্রাসঙ্গিক হলেও এই ঘটনা থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছি। কারণ, এরই পাশাপাশি এমন একটি চমকে দেওয়া ঘটনা ঘটেছে, যার দিকে দৃষ্টি ফেরানো এই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছি।

২০ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় মোহনবাগান ক্লাবের একসিকিউটিভ্ কমিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ সভায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ এইসব দেশদ্রোহী (?) ফুটবলারদের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন—এদের সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাব কোনোরকম সম্পর্ক রাখবে না। এদের মধ্যে যে আটজন মোহনবাগানের খেলোয়াড় ছিল, তারাও ক্লাব থেকে বিতাড়িত হল।

—"আপনি গতকালের মিটিংয়ে হাজির ছিলেন না কেন? আপনি থাকলে, এতবড় অন্যায় মোহনবাগান ক্লাব করতে পারত বলে মনে হয় না।" ২১ ফেব্রুয়ারী দুপুরবেলা শৈলেন মান্নার কাছে এটাই ছিল আমার প্রথম প্রশ্ন।

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, প্লেয়ারদের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে কীভাবে শৈলেন মান্না তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমার প্রশ্ন শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং দুঃখিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "গতকাল যখন মিটিংয়ের কথা জানতে পারলাম, তখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমার অন্য একটি প্রোগ্রাম বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই ঠিক ছিল। এত তাড়াতাড়ি এবং এইভাবে মোহনবাগান ক্লাব সভা ডাকবে, এটা ভাবিনি। তবে ঘুণাক্ষরেও যদি জানতে পারতাম যে, এই সভায় প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে এ ধরণের কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে, তাহলে সব কাজ ফেলে দিয়ে অবশ্যই মিটিংয়ে যেতাম। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতাম। আমি অবশ্য ফোনে ধীরেনদাকে বলেছিলাম, যা ডিসিশনই নিন, দয়া করে ভেবেচিন্তে নেবেন। আর প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলেও চট্ করে কিছু করবেন না। কিন্তু আমার ক্লাব



হঠাৎই যেভাবে ডিসিশন নিল তা অত্যন্ত দুঃখজনক। এই সিদ্ধান্তের প্রতি আমার এক ফোঁটাও সমর্থনও নেই।

প্লেয়ারদের সঙ্গে এই ক'দিনে কিছু কিছু কথাবার্তা বলেছিলাম। ওদের অসুবিধের কথাগুলো বুঝেছিলাম। মিটিংয়ে থাকলে, সেগুলো অবশ্যই বলতে পারতাম। কিন্তু কোনোরকম সুযোগই পাওয়া গেল না। কী আর বলব, যা হওয়ার, তা তো হয়েই গেছে, প্লেয়ারদের দিকটা দেখার আর কেউ রইল না।"

এদিন সন্ধ্যায় ক্লাবটেন্টে ঢোকার মুখে নজরে পড়ল, মেন্ গেটের সামনে একদল সভ্যের এক বিরাট জটলা। অত্যন্ত উষ্ণ আলোচনার মাঝে তাদের সঙ্গত ক্ষোভ প্রকাশ পেল। মোহনবাগান ক্লাবের এই পদক্ষেপ তারা কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। তারা ধিক্কার জানাচ্ছেন ধীরেন দে কে, ধিক্কার জানাচ্ছেন সভাপতি উমাপতি কুমারকে। বেশ কয়েকজন সভ্য উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বলতে পারেন, কীসের আশায় আর প্লেয়াররা মোহনবাগানে নাম লেখাবে? বেশ কিছুদিন ধরেই ধীরেন দে আর উমাপতি কুমাররা যে জঘন্য ভূমিকা পালন করছেন, তা আর সহ্য করা যাচ্ছে না। শৈলেন মান্না এবং প্লেয়ারদের 'টাইট' করার মনোভাব কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সভ্যপদ ছেড়ে দেব ভাবছি।"

দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে ঠিকই খবর পৌঁছে যায় যে, ক্লাব থেকে এই দেশদ্রোহীদের না তাড়ালে দু'হাজার মেম্বার তাদের সদস্যপদ ছেড়ে দেবার হুমকী দিয়েছেন। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী মেম্বার যে ক্লাবের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এবং দুঃখিত হয়ে ক্লাবের এই ডিসিশনের প্রতিবাদ করছেন, এ খবর তাদের কাছে কিছুতেই পৌঁছয় না। আশ্চর্য।

ঐ সন্ধ্যায় ক্লাবে ঢুকে দেখলাম, নামী-দামী কর্মকর্তারা প্রায় কেউই নেই। দু-একজন এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার বসে গল্প করছেন। হকি সম্পাদক সুকুমার মজুমদার এবং আরও দু-একজন কেষ্টবিষ্টুরা জানালেন "ক্লাব এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেয় নি। একটি বাংলা দৈনিকে আমাদের খবর বিকৃত করে ছাপা হয়েছে। আসলে আমাদের ডিসিশন—এ আই এফ এফ এর মিটিংয়ে এই ফুটবলার-দের ব্যাপারে যতোদিন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া না হচ্ছে, ততদিন এরা আমাদের ক্লাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। এটা সাসপেনশন নয়।

—"তাহলে আপনারা কাগজে আপনাদের বক্তব্য বিকৃত করার জন্য প্রতিবাদ জনোচ্ছেন না-কেন ?"

—"প্রতিবাদ আজকেই জানানো হচ্ছে। কালকের কাগজে আশা করি প্রকাশিত হবে।"

পরদিন সংবাদপত্রে প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র নামগন্ধ নেই। বরং আর একটা খবর প্রকাশিত হল। ধীরেন দে এবং উমাপতি কুমার রাই-টার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাদের ভূমিকার কথা খোলসা করে বলেছেন। দুর্দান্ত (!) বিবৃতি দিলেন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী।—"এই সমস্ত প্লেয়ারদের ফ্ল্যাট বা জমি কেড়ে নেওয়া যায় কিনা দেখছি।"

আমাদের কাছে খবর আছে, উমাপতি কুমার ঐ দৈনিক পত্রের এক প্রতিনিধির কাছে টেলি-ফোন করে প্রকাশিত সংবাদটির প্রতিবাদ করে বলেছেন, "আমি আর ধীরেন অন্য ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, এই ব্যাপারে নয়।"

তবে ঘটনার সামনে পড়ে থাকা আবছা পর্দাটা সম্পূর্ণ উঠে গেল ২২ ফেব্রুয়ারী রাতে। রেডিওর সংবাদ বিচিত্রায় উমাপতি কুমার যে বক্তব্য রাখলেন, তাতে 'বিতাড়িত' কথাটার পরে আর কোনো প্রশ্নবোধক চিহ্ন রইল না। ইস্ট-বেঙ্গল সভাপতি বিধুভূষণ ঘোষও মোটামুটি একই বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু মহঃমেডানের এরফান তাহেরের কোন বক্তব্য আমরা পেলাম না কেন ? তাঁকে ধরা যায়নি ? মিথ্যে কথা। আমাদের খবর, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রতিনিধি তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি এমন কিছু বলেন নি, যেটা সরাসরি প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। অতএব বাদ।

১৬ আগস্টের দুর্ঘটনার পর বিদেশ বসুকে ঘিরে ময়দান খানিকটা তোলপাড় হয়েছিল। তখন মোহনবাগানের শৈলেন মান্নার অভিনন্দন-যোগ্য ভূমিকার কথা আমরা ভুলিনি। মনে রেখেছি এই ধীরেন দে, উমাপতি কুমার এবং যতীন চক্রবর্তীর প্রতিহিংসাপরায়ণ ভূমিকার কথাও। হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমীর শুভেচ্ছায় বিদেশ ষড়যন্ত্রের জাল ছিড়ে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু ধীরেন দে, উমাপতি কুমার এবং যতীন চক্রবর্তী—এই তিন রাহুর কবল থেকে মোহনবাগান ক্লাব কবে উদ্ধার পাবে ?

●

২১ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, রাত এগারোটা। টেলিফোনের রিসিভার ধরে আমি কথা বলছি। ওপাশে রিসিভার হাতে খেলোয়াড়টির মুখ আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। ওর ঠোঁট এবং গলা কাঁপছে। বুকের মাঝ থেকে ওগরে আসা কান্নাটাকে জোর করে ঠেলে ভেতরে পাঠাচ্ছে ও। কান্নাভেজা কণ্ঠে ও প্রথম কথা বলল, "শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাব সাসপেণ্ড করল! উফ্!" একটু থেমে প্রসূনের অভিমানী কণ্ঠ আবার জানাল, "বাংলার ক্রীড়ামোদীরা এই ঘটনায় চুপ করে থাকবে ? দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করিনি, আমার প্রিয় ক্লাব থেকে এই আঘাত পাব। সবুজ-মেরুনের ইজ্জত রাখতে গত সাত বছরে আমি আর বাবলু কী করিনি ? বাংলার মানুষ তো জানে, আমরা মোহনবাগানকে কোনদিনও কোন আঘাত দিই নি। আমাদের ভালবাসা এই ক্লাবের প্রতি হৃদয় উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলাম। প্রতিদানে এ কী পুরস্কার পেলাম ? মোহনবাগানের অসম্মান-কে নিজের মায়ের অসম্মান বলে ভাবতাম। 'মোহনবাগান' নামটা আমার রক্তে শিহরণ জাগাত। আজ...।"

কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝেই থেমে যাচ্ছিল ও। গলায় কথা আটকে আসছিল। কোনরকমে ঢোক গিলে আবার বলল, "খবরটা পাওয়ার পর থেকে এক মুহূর্তও স্থির হয়ে বসতে পারছি না। আজ মোহনবাগান ক্লাবও অভি-যোগ করছে, আমরা টাকার দাস। গত কয়েক বছরে কত বেশী টাকার অফার আমি মোহন-বাগানের স্বার্থের কথা ভেবে হেলায় ফিরিয়ে দিই নি ? এবছরও মোহনবাগানের লোক ক্যাম্পে গিয়ে লোভ দেখায় নি ? ওঃ। আমি কিছু ভাবতে পারছি না। সকলে যখন আমাদের দিকে অপমানের তীক্ষ্ণ তীর ছুড়ে দিচ্ছে, তখন ক্লাব আমাদের পাশে দাঁড়াবে, ভেবেছিলাম। এখন ভাবতে ঘৃণা হচ্ছে যে, এই ক্লাবে গত সাত বছর পড়েছিলাম, এই ক্লাবকে ভালবেসেছিলাম, এই ক্লাবের পতাকা উঁচুতে তোলার চেষ্টা করে-ছিলাম।

মোহনবাগান যদি ভেবে থাকে এভাবে আমাদের শায়েস্তা করবে, ভুল ভেবেছে। দরকার হলে ছোট ক্লাবে খেলব। কিন্তু খেলা ছাড়বনা। কালই আমি কথা বলব বাকী সাতজনের সঙ্গে। আমরা একইসাথে অপমানিত হয়েছি, একই সাথে চলার প্রস্তাব রাখব। আমরা শুধু টাকার জন্য খেলিনা, একথা প্রমাণ করার সময় এসেছে।

ভাবা যায়, আজ আমার 'অর্জুন' পুরস্কার নিয়ে টানাটানি চলছে। আমাদের ছোট একটা ভুলের জন্য চারিদিকে শত্রুরা মরণফাঁদ বিছিয়ে রেখেছে। আজ আমাদের যে অপবাদের মুখে ঠেলে দেওয়া হল, গাছে তুলে যেভাবে মই কেড়ে নেওয়া হল,' আমাদের উপর যে অবিচার হল, ক্রীড়ামোদীরা তা যেন না ভোলেন। এইসব বিশ্বাসঘাতকদের কোনোদিনও তারা যেন ক্ষমা না করেন।"

পরদিন দুপুরে শ্যামনগরে মানসের বাড়ীর দরজায় টোকা মারতেই দরজা খুলে দিলেন ওর দাদা। সকালবেলা ফুটবলার শংকর ব্যানার্জির পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। সবে শ্মশান থেকে ফিরেছে মানস। ঘুমোচ্ছিল ও। আমি যেতে উঠে বসল। কথা শুরু করলেন ওর বাবা।

—"ওরা ক্যাম্প ছাড়ার পর যা অশান্তিতে ছিলাম সেটা শতগুন বাড়িয়ে দিল মোহনবাগান ক্লাব। মোহনবাগানের এই ডিসিশন যেন মড়ার ওপর খাড়ার ঘায়ের মত আঘাত করেছে। গভীর রাতে মানসকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেছে ক্লাবের গাড়ী। যে ক্লাবের কর্মকর্তারা ওদের ক্যাম্প ছাড়ার জন্য ফুসলিয়েছে, তারাই আজ ভোল পাল্টে রাতারাতি দেশপ্রেমিক বনে গেল।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সদাব্রতবাবুকে লক্ষ্য কর-ছিলাম। দুশ্চিন্তা, ভয়, দুঃখ এবং ক্রোধের ছাপ একই সঙ্গে প্রতিভাত হচ্ছে মুখে। বাবাকে মাঝ-পথে থামিয়ে দিয়ে মানস বলল, "অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু এখন না। সময়-সুযোগ আসবেই। এইসব কর্মকর্তাদের মুখোশ খুলে দেব। আমার শুধু একটাই সান্ত্বনা। যে মানুষটার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় এতদিন ক্লাবে ছিলাম, তিনি তো অন্তত আমাদের ভুল বোঝেন নি। মান্নাদা বাবাকে বলেছিলেন, 'বাড়ীতে মানসের অভিভাবক আপনি আর ময়দানে আমি।' কথাটা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

আমরা শুধু টাকা নিই ? ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টারের সাহায্যকল্পে বাবলুদা আর সুরজিৎদার ডাকে আমরা এগিয়ে যাই নি ? বন্যাকবলিত মানুষদের উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিনি ? এসব কথা বলে আর কী হবে ? আজ সবাই আমাদের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে ধরেছে। গতকাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ায় ভাস্কর আর মনা প্রচণ্ড বিপদে পড়েছিল। তবে এদিক থেকে আমি ভাগ্যবান। আমার পাড়ায় বা অফিসে কোনোরকম বিরূপ সমালোচনার মুখে আমাদের পড়তে হয়নি।

অনেক ভেবে দেখলাম, ক্লাবকে ভালবেসে কোনো লাভ নেই। আমাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। প্রসূনদা-গৌতমদা-বাবলুদার অবদানও ক্লাব ভুলে গেল। সুযোগ পেলেই কর্মকর্তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। ব্যতিক্রম বোধহয় মান্নাদা। একটা কথা আমি মনেপ্রাণে

৯০ পৃষ্ঠায়

# মোহনবাগানের আট ফুটবলার কি মহমেডানে আসছে? / রাইটার

এশিয়ান গেমসের ক্যাম্প থেকে বেরনোর দুদিন পরে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাথুজ অসহায়ের মতো ছুটে গেল 'জীবনদীপে' স্টেট ব্যাঙ্ক অফিসে প্রশান্ত ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে। বলল, "প্রেমনাথ ফিলিপ ইস্টবেঙ্গলে আসছে, আমাকে তোমাদের মহমেডানে নিয়ে নাও।" আমাকে ইস্টবেঙ্গল রাখতে চাইছে। কিন্তু কী ভরসায় থাকব?" সুরজিৎ-প্রশান্ত ওকে সরাসরি মহমেডান কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পরামর্শ দিল, "আমাদের করার কিছু নেই।" আশায় বুক বেঁধে ম্যাথুজ যখন মহমেডান শিবিরের দিকে পা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নিচ্ছিল তখন পাশের শিবিরে এক নাটকীয় 'দেশপ্রেমিক' সিদ্ধান্তে এরফান তাহেরের দলবদলেরা কেঁপে উঠলেন এবং ম্যাথুজ দাঁড়িয়ে পড়ল।

মহমেডানের রিক্রুটিং কর্মকর্তারা দলবদলের বাজারে নামলেন ১৬ ফেব্রুয়ারী। ১৪ ফেব্রুয়ারী ক্লাবের নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট এরফান সাহেব নির্দেশ দিলেন তাঁদের, "গতবারের টীমটাকে ঠিক রেখে অন্য টীম থেকে কয়েকজনকে নেওয়ার চেষ্টা কর।" কিন্তু এই নির্দেশ এত বিলম্বে ঘোষিত হল, ততক্ষনে অমলরাজ ও প্রেমনাথ ফিলিপ ইস্টবেঙ্গলের কব্জায় চলে গেছে, এবং সুরজিৎ-চিন্ময়-ভাস্করের সঙ্গে মোহনবাগানের তেওয়ারী-রজত চক্রবর্তির কথা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। মহমেডানের ধারণা ছিল, তাদের টীমের ভাস্কর ছাড়া আর কারোর কোথাও যাবার রাস্তা ছিল না, তাই মহমেডানের কর্মকর্তারা তুরান্ত শেষ হওয়ার পর কোনো খেলোয়াড়ের সাথেই প্রয়োজনীয় যোগাযোগও রাখলেন না। সন্তোষ ট্রফিতে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান লোক পাঠাল তাদের খেলোয়াড়দের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক রাখার জন্য। কিন্তু মহমেডান চুপচাপ বসে রইল। যে-ক্লাব নির্বাচন আদৌ এরফান সাহেবের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল না, সেই নির্বাচনকে অত্যধিক গুরুত্ব দেখাতে গিয়ে মহমেডান টীম-ভাঙার রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন।

মোহনবাগান ক্লাব ধীরেন দের অনুমতি নিয়ে এক মাস ধরে সুরজিৎ-ভাস্কর-চিন্ময়ের পিছনে লেগে রইল। শেষ পর্যন্ত রাজী করিয়ে নিয়েছিল ওদের। বিশেষ করে সুরজিৎকে ওরা সবার আগে পেতে চেয়েছিল এবং পেয়েও গিয়েছিল। ভাস্কর-চিন্ময়ের সঙ্গে যেদিন মোহনবাগানের পাকা কথা হওয়ার কথা ছিল সেইদিন সকাল থেকে মহমেডানের হায়দর আলি নস্কর কলকাতা-খড়দহ করলেন কয়েকবার চিন্ময়ের অভিভাবক কালিদাস বাবুকে



সুরজিৎকে পাওয়ার জন্য মোহনবাগান আগ্রহী

টেনে আনলেন কলকাতায়। পি এন টি মাঠ থেকে হায়দর সাহেব দুপুর বেলায় তুলে আনলেন ভাস্কর-চিন্ময়কে। হাজির করালেন এরফান সাহেবের সামনে। চিন্ময় রসিকতা করে বলল, "দুটোর পরে আসলে আমাদের ফিরে পেতেন কিনা সন্দেহ। আপনারা কথা বলবেন বলেও দীর্ঘদিন দেখা করলেন না কেন?"

"ব্যস্ত ছিলাম"..."ভুল হয়ে গেছে"—এই বলে হায়দর সাহেব এড়িয়ে গেলেন।

ময়দানের একশ্রেণীর কর্মকর্তা, কিছু ব্যক্তি এবং কিছু সাংবাদিক রটাতে লাগলেন সুরজিৎরা নাকি মোহনবাগানে যাওয়ার জন্য ভীষণভাবে ধরাধরি করছে। নিন্দুকরা অনেক কিছুই রটনা করেন। আমাদের হাতে এমন প্রমাণ ও কিছু খবর আছে যেগুলো তুলে ধরলে ধীরেন দে, তেওয়ারী, রজত চক্রবর্তী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন, "হ্যাঁ, আমরা সুরজিৎ—ভাস্কর-চিন্ময়কে পাওয়ার জন্য খুবই আগ্রহী। আমরাই উদ্যোগী হয়ে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। মানস-গৌতম-সুব্রত-প্রসুনরাও সুরজিতদের নেওয়ার ব্যাপারে ক্লাবকে তাড়াতাড়ি কথা বলতে বলেছিল।

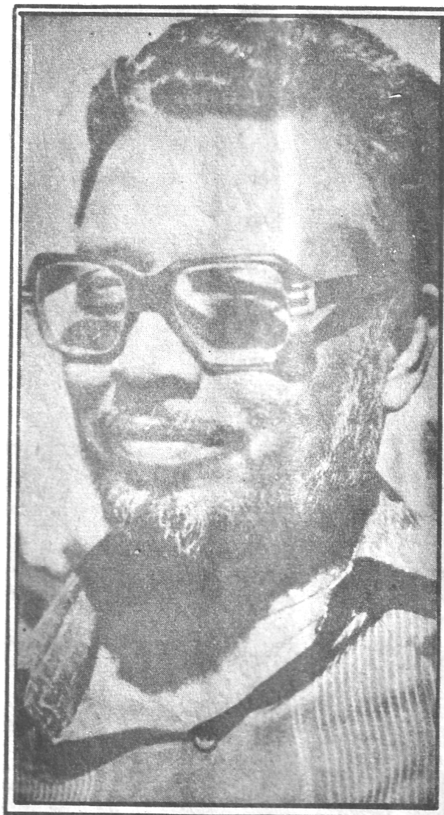
২১ ফেব্রুয়ারী মহমেডান ক্লাবের এক জরুরী সভা ছিল। রাত্রি আটটার সময় ক্লাব টেন্টে পৌঁছে জানতে পারলাম, মোহনবাগানের বিতাড়িত আট ফুটবলারকে নিয়ে ক্লাব নতুন চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল অথবা মোহনবাগান ক্লাব কী করল, সেই নিয়ে মহমেডান ভাবছে না। শুধু একটাই চিন্তা, যদি সেই আট ফুটবলারকে নিতে গিয়ে ক্লাবে হামলা হয় তাহলে কী করবে? নবনির্বাচিত সহঃ সভাপতি সাহাজাদা পরভেজ এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক আরসাদ সাহেব বললেন, 'আমাদের প্রথম চিন্তা, কী ভাবে টীমটাকে ভালো করা যায়—সেই নিয়ে। এ আই এফ এফ থেকে কোনো প্লেয়ারকে সাসপেণ্ড না করলে টীম করতে বা শিবিরত্যাগী খেলোয়াড়দের নিতে বাধা কোথায়? আমরা অনেক বছর সাফার করেছি, তখন কোনো টীম খেলোয়াড় দিয়েও সাহায্য করেনি আমাদের। সুতরাং আমরা ভালো টীম করার জন্য যাদের দরকার তাদের নেব।"

একদিন পরে মহমেডান ক্লাব দ্বিতীয় সভা ডাকলেন 'আট ফুটবলার'কে নেওয়ার সিদ্ধান্তে। কয়েকটি ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাইট ব্যাক, লেফট হাফ, স্টপারে, স্ট্রাইকারে এমন কয়েকজন আছে যাদের পরিবর্তে কম্পটন, প্রসুন, সুব্রত, মিহিরকে নিতে গিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হবে না তো? মহমেডান কর্মকর্তারা 'যারা আছে' এবং 'যাদের নেবে' তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলে নিতে চান, যেন কারোর কোনো ক্ষোভ না থাকে। ইতিমধ্যে সেই চার ফুটবলারের সাথে কথাও চলেছে প্রাথমিক পর্যায়ে। ফিলিপ-অমলরাজের জায়গায় শ্যামল ব্যানার্জি-গৌতমকে পেলে মহমেডান লাভবানই হবে। 'দেবাশিসের পায়ে চোট' এই অভিযোগে মহমেডান দেবাশিস রায়কে ছেড়েও দিতে পারে। মানস বিদেশ এলে ডেনিস-দেবাশিস ইস্টবেঙ্গলে চলে গেলেও মহমেডানের ক্ষতি হবে না। সাবির ক্যাম্পে থাকলে মিহিরকে দরকার। আকবর মহমেডান ছাড়বে না আগেই জানিয়ে দিয়েছিল।

গতবছর থেকে টীম করার ক্ষেত্রে মহমেডানের 'ভাগ্য' খুব কাজ করছে। আশী সালে ইস্টবেঙ্গলকে ভাঙিয়ে মহমেডান ঘরে বসে অল্পদিনের মধ্যেই টীম করল। এবারও মোহনবাগান আট ফুটবলারকে বিতাড়িত করে মহমেডানের শক্তিশালী টীম করার পরিশ্রমকে লাঘব করল।

# কথাবার্তা, কথাবার্তা

[প্রায় দেড়যুগ বাদে দুই দাদা-ভাই বন্ধুর পুনর্মিলন। ভীষণ আবেগে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছেন। দু'চোখ বেয়ে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু নীরবে বয়ে চলেছে। অদূরে সাক্ষীর মত বারবাটি স্টেডিয়াম। আর এযুগের কয়েকজন হতভম্ব কৌতূহলী, ভিনরাজ্যের আগন্তুক অবলোকন করলেন, ভারতের দুই প্রাক্তন কৃতী ফুটবলার ইউসুফ খাঁন ও প্রশান্ত সিনহা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে বাক্‌রহিত হয়ে পড়েছেন। মিলনের আকস্মিকতায় হয়তো বা জেগেছিল আবার বিচ্ছেদের মর্মবেদনা। ইউসুফ খানের পড়ন্ত বেলায় মধ্যাহ্নগগনে ছিলেন প্রশান্ত সিন্‌হা। খেলোয়াড় জীবনের শেষ চার বছর ইউসুফ খাঁন পেয়েছিলেন প্রশান্ত সিন্‌হার সান্নিধ্য। উভয়ের কাছেই সে স্মৃতি অম্লান। বুঝিবা উভয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছেন মিঠে অতীতকে। আর ঠিক তখনই কটকে গত ১৪ জানুয়ারী খেলার কাগজের পক্ষে ইউসুফ খাঁনের সঙ্গে কথা বলেছেন প্রদীপ নাগ ]



**ইউসুফ খাঁন:** কী আর জানাতে পারব প্রিয় পাঠকদের। আমিতো মূল ভারতীয় ফুটবল স্রোত থেকে দূরে। গ্রাম থেকে শহরে আসার মত ফের হায়দ্রাবাদে বদলি হয়েছি অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলের প্রশিক্ষক পদ নিয়ে। একযুগ পরে এই আবার সন্তোষ ট্রফি দেখছি।

**খেলার কাগজ:** আপনার ফুটবল জীবনের শুরু কীভাবে? হঠাৎ খেলা ছেড়ে ও অনেক দিন ভারতীয় ফুটবল রঙ্গমঞ্চ থেকে নিজেকে দূরে রেখে আবার ফিরে আসার আনন্দকাহিনী শুনতে ইচ্ছে করছে।

**ইউসুফ খাঁন:** স্কুল ছাড়ার পর অন্ধ্রপ্রদেশের ফুটবল প্লেয়ার জন্ম দেবার পীঠস্থান সিটি কলেজ ওল্ড বয়েজে ১৯৫৩ সালে একবছর খেলেছিলাম। সে সময়কার খুব শক্তিশালী দল হায়দ্রাবাদ পুলিশ ডেকে নিয়ে গেল ১৯৫৪ সালে। দু'বছর সেন্ট্রাল পুলিশ লাইন্সে খেলে জায়গা হ'ল অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ দলে। ১৯৫৫-য় এস, কে, মইনুদ্দিনের নেতৃত্বে এরণাকুলামে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবলে প্রথম হায়দ্রাবাদ রাজ্য দলের জার্সি পরি। এই কটকেই ১৯৬৭তে এসেছিলাম অধিনায়কত্ব করতে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে আসার সুযোগ এল প্রি অলিম্পিক আসরে। এস, এ, লতিফের অধিনায়কত্বে (১৯৫৯) কাবুলে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সে খেলা হয়েছিল। এরপর রোম অলিম্পিক (১৯৬০) প্রি অলিম্পিক (১৯৬৪), জাকার্তা ('৬২) এবং ব্যাঙ্কক ('৬৪) এসিয়াডের ফাঁকে মারডেকা টুর্ণামেন্টে খেললাম যদিও মাঝে তিনটে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হাতছাড়া হয় আহত থাকার জন্য। (বাঁপায়ের থাইমাসেলে হাত দিয়ে দলা পাকানো মাংস স্পষ্ট অনুভব করলাম)। ১৯৬৬তে অর্জুন পুরস্কার পেলাম আপনাদের শুভেচ্ছায়! পায়ের ব্যথা আমাকে খানিকটা তাড়াতাড়ি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সরিয়ে আনলেও ১৯৬৯ পর্যন্ত আমার একমাত্র প্রিয় ক্লাব ও কর্মস্থল হায়দ্রাবাদ পুলিশে খেলা চালিয়ে যাই। অবশ্য প্রথম এশিয়ান অলস্টার ফুটবল টীমে (১৯৬৬) জার্নেল সিংএর সাথে আমিও দলে নির্বাচিত হয়েছিলাম।

**খেলার কাগজ:** ১৯৬৫-র মার্ডেকা ফুটবল টুর্নামেন্টে বিশেষজ্ঞরা আপনাকে অসাধারণ রাইট হাফ বলে চিহ্নিত করেছিলেন অথচ আপনি অনেকবার ফরোয়ার্ডে খেলে ভারতকে জিতিয়েছেন।

**ইউসুফ খাঁন:**—হ্যাঁ কথাটা ঠিক। আমি অবিস্মরণীয় কোচ প্রয়াত এস এ রহিমের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনমত জায়গা বদল করে খুবই সফল হয়েছি যেমন, জাকার্তায় চতুর্থ এশিয়াডের ফাইনালে কোরিয়াকে আমরা ২-১ গোলে হারিয়েছি। ফাইনালে পি কে, আমি, জার্নেল সিং (একটি গোলও করেন ফরোয়ার্ড খেলে) চুণী ও বলরাম খেলেছিলাম। আবার ১৯৬৬তে ব্যাঙ্কক এশিয়াডে খেললাম হাফ পজিসনে। রোম অলিম্পিকে নির্বাচিত হলাম হাফ ব্যাকে কিন্তু ফরোয়ার্ডেও খেলেছি। শেষের দিকে রহিম সাহেবের শিক্ষণে রাইট ও লেফট হাফব্যাক এবং রাইট ইন ও সেন্টার ফরোয়ার্ড এই চার জায়গাতেই কোনো না কোনো সময় আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছি।

**খেলার কাগজ**—একটা পুরনো প্রশ্ন করছি। এখনকার ফুটবল কী রকম দেখছেন, যেমন খেলেছিলেন সে তুলনায়?

**ইউসুফ খাঁন:**—নিজেদের ফেলে আসা দিনগুলি হাতড়াতে কার না ভাল লাগে বলুন। কটকে এসে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তের বছর বাদে এই একই জায়গায় এ কি ন্যাশনাল খেলা দেখছি জানি না। আগের দিনের সাথে কোনো মিলই যে খুঁজে পাচ্ছি না। এই সেই বাংলা দলের ছন্দময় খেলা? হায় রে ভারতীয় ফুটবল!

**খেলার কাগজ**—অন্ধ্রকে আর সবল দেখাচ্ছে না কেন?

**ইউসুফ খাঁন:**—(উদাস কণ্ঠে) আমাদের হায়দ্রাবাদে তখন কত ফুটবলার: আজিমুদ্দিন, আমেদ হোসেন, নুর মহম্মদ, টি বলরাম, মইনুদ্দিন প্রমুখদের সাথে লড়ে ভারতীয় দলে আসতে হত। আর এবারকার অন্ধ্রপ্রদেশের ছেলেদের গড় বয়স ২৩ বছর এই যা। দক্ষ প্লেয়ার কই? হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ সব জায়গায়ই পরিশ্রমী নিষ্ঠাবান প্লেয়ারের আকাল।

**খেলার কাগজ**—তবু কার কার বা কোন দলের খেলা ভাল লাগল?

**ইউসুফ খাঁন:**—(চশমার কাঁচ পরিষ্কার করার ফাঁকে দর্শক পরিচিত দাড়িতে বারকয়েক হাত বুলিয়ে নিলেন) কী করে বলি বলুন? আমিতো ফেডারেশন থেকে নির্বাচিত "ট্যালেন্ট স্পটার অথবা প্লেয়ার নির্বাচক" নই। সে রকম ভাবে কিছু নজর করিনি।' তবে চোখ পড়ার মতো তেমন কেউ নেই বললেই চলে। এর ওপর বেশীর ভাগ শক্তিশালী দল নাকি রাউণ্ড-রবিন লীগ খেলায় খেলেছে, ওঁদেরকে তো জানিই না। যেমন ধরুন আমার দলে লেফট হাফ ব্যাক ফরিদ ছাড়া স্কিল্ড প্লেয়ার আর কোথায়? বাংলার ছোট মাপের বিরাট গোলকীপার ভাস্কর ছাড়া আর কারো খেলা মনে ধরল না যাঁদের নাম ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলার মধ্যে পড়ে। তবু দেখলাম গোয়া দলের কিছুটা টীমওয়ার্ক ও

থ্রাস্ট আছে। ওড়িশা শেষের দিকে অনেকটা উন্নতি করেছিল।

**খেলার কাগজ** –বাংলা শিবিরে আহতের সংখ্যা বেশী হয়েছিল বলে অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল দলটি। তাই—

**ইউসুফ খাঁন** ঃ—কথাটা ঠিক। তবে ( পায়ে অসংখ্যক কাটা ছেঁড়ার দাগসহ নানা চোটের স্মারকগুলো নির্দেশ করলেন ) এখন প্লেয়াররা কেমন যেন বাবুবাবু ভাব নিয়ে খেলে ছোট থেকেই। একটু লাগলেই স্ট্রেচার চাই। আমাকে কতবার, ডাক্তার অপারেশন করতে বলেছেন। আমি বিরাট চোট ও ব্যথা নিয়েই চালিয়ে গেছি তিন বছর। একটু সহিষ্ণুতা না থাকলে ফুটবলার হওয়া যায় না।

**খেলার কাগজ ঃ** আপনি ১৯৭৪এ এন. আই. এস কোচ হয়েও এতদিন বাদে কোচিং করা শুরু করলেন কেন ?

**ইউসুফ খাঁন** তাও পুরোপুরি সুযোগ পেলাম কোথায় ? ম্যানেজার পিটার রঙ্গস্বামী ( গোলরক্ষক থঙ্গরাজের দাদা ) একরকম চীফ কোচ হয়েই এসেছেন। আমি এখনও অন্ধ্র দলকে পুরোপুরি মনোমত হাতে পাইনি। আর আমার সার্ভিস কেউ চাইলে তবে তো দেব। শেষ পর্যন্ত আমার প্রাণস্বরূপ হায়দ্রাবাদ পুলিশে কোচিং করার সুযোগটুকুও না পেয়ে ছুটি নিয়ে পর পর দু'বছর সি. আর. পি. এবং আসাম পুলিশ দলকে কোচ করলাম। আসাম খুব ভাল ফল দেখাল। আমিও পুরস্কৃত হলাম একটি বদলির বিনিময়ে। আন্ধ্রর এমন এক গ্রামে পাঠান হল যেখানে ফুটবল ছাড়া আর সব কিছু আছে। এখন ড্রিল মাস্টার পদ নিয়ে কোনো রকমে হায়দ্রাবাদে ফিরে এসেছি।

**খেলার কাগজ ঃ** শুনলাম তোমার পূর্বসূরী নূর মহম্মদ, আজিজ প্রমুখরা যতদিন আছেন ততদিন—

**ইউসুফ খাঁন ঃ** ভবিষ্যৎ নেই এই তো ? আমি এর উত্তর দিতে চাই না। তবে খোসামোদ করতে পারব না কেবল হাসিমুখে ভাল ব্যবহার করা ছাড়া। এখানে এসে বুঝলাম, আমার ফুটবল খেলা সার্থক। লোকে তাহলে আমাকে হারিয়ে ফেলেনি দেখছি। এইটুকু থাকলেও যথেষ্ট।

**খেলার কাগজ :** আপনাকে কলকাতায় পেলাম না এটাই আমাদের দুঃখ।

**ইউসুফ খাঁন ঃ** কতবার যে ডাক এসেছিল। সে আদরের সাড়া দিই নি হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের প্রতি আনুগত্যে। কিন্তু হায়! যাক্ সেকথা। গতবছর পর্যন্ত মহমেডান অফার দিয়েছিল। মন চাইল না এখনকার নোংরা ক্লাব ও প্লেয়ার পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়তে। প্রশান্ত সিংহের সাথে রোজ সেই সোনার আলোর দিনগুলি নিয়ে খোশগল্পে কাটিয়ে দিচ্ছি—এইই জল।

# সন্তোষে অসন্তোষ

### বিশেষ প্রতিনিধি

কুপার সাহেবকে নিয়ে সবাই হিমসিম। তার প্রবর্তিত বিশেষ অভীক্ষা দেশবিদেশের ফুটবল রেফারিদের শারীরিক সক্ষমতা নির্ণয়ের এক বিশেষ ব্যারোমিটার। ভারতে রাজ্যস্তরে এবং জাতীয় পর্যায়ে সন্তোষ ট্রফি ও ফেডারেশন কাপে ঐ মাপকাঠি এখন থেকে হবে অবশ্য প্রযোজ্য বিষয়। ৩৭তম জাতীয় ফুটবল প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে রাউড়কেলায় গত ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর রেফারিদের কুপারটেস্ট নামক আবশ্যিক ব্যাপারটা ছিল কৌতুহলোদ্দীপক নতুন কিছু। এতে প্রত্যেক রেফারিকে ১২ মিনিটে বয়স ভিত্তিতে কমবেশী দু'হাজার মিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। এছাড়া ৫০ গজ স্প্রিন্ট এবং ৪ × ১০ মিঃ সাটল রিলে নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতে হয়েছে। দেখা গেছে 400 মিঃ দূরত্ব সকলের পক্ষে ৭৫ সেকেণ্ডে পৌঁছন বিশেষ অনুশীলনসাপেক্ষ। সারা ভারত থেকে ২০ জন নির্বাচিত রেফারির প্রায় সকলে সব বিষয়ে চার্ট মাফিক উত্তীর্ণ হয়েছেন নবপ্রবর্তিত এই সক্ষমতার পরীক্ষায়। নইলে অকৃতকার্যতা আপাত লজ্জাকর পরিস্থিতি—নিজেদের পয়সায় রাজ্যে ফিরে যেতে হোত। লাগোয়া রাজ্য বলে বাংলা থেকে মনোনীত হয়েছিলেন ছয় জন। এঁরা সকলেই কুপার টেস্টে একসেলেন্ট বা সর্বোচ্চ গ্রেড পেয়েছেন আরো কয়েকজন সহ। কুপার টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হলে প্রত্যেক রেফারিকে এখন থেকে সারা বছর দৌড়ঝাঁপে ব্যস্ত থাকতে হবে। এই সময়সাপেক্ষ সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ খাদ্য সামগ্রী, অর্থ ও সময় কীভাবে কোন উৎস থেকে রেফারিরা সংগ্রহ করবেন — এসব না চিন্তা করেও বলা চলে, অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন প্রবর্তিত নবতম প্রকল্প প্রশংসনীয়। রেফারিরা এখন থেকে বাৎসরিক প্রস্তুতি নিতে বাধ্য। আর এর ফলে ওঁদের সাথে উপকৃত হবেন টীমরা। বলা হয়ে থাকে, ঘটনার নৈকট্যে রেফারির উপস্থিতি, সিদ্ধান্তগত ত্রুটিমুক্তির অন্যতম সমাধান।

অপ্রত্যাশিতভাবে ন্যাশনাল থেকে বাংলা সরে এল। গত বছরের বিজেতা পাঞ্জাবের মুখোমুখি হল ভারতীয় রেল দল। বাংলাবিহীন ফাইনালে বঙ্গ-রেফারিদের একটা সুযোগ এসে গেল। এরকম এক যোগাযোগে, ১৯৬১ ( বম্বে ন্যাশনাল ), প্রভাত অরুণ সোম বাংলা থেকে শেষ সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে রেফারিংয়ের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। অনুরূপ সুযোগ আবার এসেছিল ১৯৬৩. '৬৬, '৭০ এবং '৭৩ সালে। অবশ্য '৬৬ ও '৭৩এ রেলওয়ে দল ফাইনালে থাকায় ধুয়ো তোলা হয়েছিল যে বাংলার সাথে সম্পর্কযুক্ত লোক যেন না খেলান। তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ রেখে অশোক ঘোষের কটক আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরণের অন্যায় আবদারের কথা মনে করান হল। রেল একটি সর্বভারতীয় দল। বাংলার দু'নম্বর টীম কথাটা বাঙালির আত্মপ্রসাদ বা ভিন্ রাজ্যের লোকের মুখের অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয়। সেদিন রাতে ডিনার টেবিলে, জিয়াউদ্দিনের সাথে আলাপে, কটকে অবস্থানরত বাংলার তিনজনকে ফাইনালে খেলানোর সুযোগের ব্যবস্থায় ডিটো মিলল — এই প্রথম। কিন্তু চক্রান্ত সক্রিয়। পাঞ্জাবকে দিয়ে তীব্র আপত্তি তোলান হল। অশোক ঘোষ আমল দিলেন না। পরের দিন সকালে ম্যানেজার কেশকৃপাল সিং কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের কর্মী রবি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি জানাতে ভুললেন না। রেলওয়ে আইন অনুযায়ী ৬৫০ কিমিঃ বা তার বেশী রেল লাইন কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকায় কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট দল আন্তঃরেল খেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই নিয়মে পোর্টের কয়েকজন জাতীয় ফুটবলে রেল দলে স্থান পেয়েছেন। অতএব পাঞ্জাবী বক্তব্যে প্রকাশ, অন্তত রবিবাবু যেন না খেলান। এবার রেফারি নির্বাচক কর্মকর্তারা ভেবে দেখবেন জানালেন। প্রথমদিন ফাইনালে মাঝমাঠে, এলেন দিলীপ সেন। সঙ্গে প্রদীপ নাগ ও দিল্লীর ডি এস বিস্ট। খেলার শেষে রেফারি সম্পর্কে বিশেষ প্রশংসাই হোল। এদিকে সর্বভারতীয় মিটিং শেষ। পূর্ব ব্যবস্থামত উচ্চপদস্থ কর্তারা সবাই এদিন রাতে, নয় পরের দিন সকালে কটক ত্যাগ করলেন। আশ্চর্য, দ্বিতীয় দিন ফাইনালে এলেন কলকাতাখ্যাত জে পি কুটিনহো, যিনি নিজেও বম্বে পোর্টের একজন দীর্ঘদিনের কর্মী। আরো বিস্ময়, কুটিনহোর সাথে লাইন্সম্যান্ মাদ্রাজের এল জোসেফ যিনি সাদার্ণ রেলের চাকুরে ও রেলের প্রাক্তন খেলোয়াড়, অপরজন প্রথমদিনের বিস্ট আবার। তাহলে যে প্রথাগত আইন বা অজুহাতে সিনিয়র রেফারি রবিবাবু ফাইনাল থেকে বাদ পড়লেন সেই তথাকথিত একই দোষে দুষ্ট অপর দু'জন কিন্তু অলক্ষ্যে খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন সন্তর্পনে।

সন্তোষ ট্রফি ফাইনালে সাধারণত বাংলা থাকে বলে বাঙালি রেফারির পোস্টিং পাওয়া একরকম দুর্লভ ব্যাপার। অথচ রবিবাবু যিনি একরকম নির্বাচিত হবার আভাস পেয়েছিলেন, শেষ সময়ে কাটা পড়লেন। রাগে-দুঃখে, ক্ষোভ বা অভিমানে তিনি অনুমতি নিয়ে একদিন আগেই কলকাতা রওনা হলেন। ফাইনাল খেলার অনুমতি পেলে রবিবাবু হয়তো এবছর ইন্টার ন্যাশনাল রেফারি প্যানেলে আসার শেষ সুযোগটুকু পেতেন। মুখ বুজে, বঞ্চনার পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বুকে বয়ে তাকে হয়তো বাকি ফুটবল দিনগুলোয় ধুঁকতে হবে ময়দানের মাঠে মাঠে।

# এসো আমরা ফুটবল খেলি   সুরজিৎ সেনগুপ্ত

## আঠারো

যে অদ্ভুত লোকগুলোকে নিয়ে আমরা কথা বলব ঠিক করেছি, তাদের নিয়ে আলোচনার কোনও শেষ নেই। কোন অদ্ভুত লোকগুলো? বাঃ, ভুলে গেলে! ওই যে, যারা ফুটবল মানে 'পা বল' হাত দিয়ে খেলে। হ্যাঁ গোলকীপার। ভাল গোলকীপার হওয়ার জন্য যেসব গুণ থাকা দরকার তার মধ্যে দু একটা কথা আগের দিনই আলোচনা হয়েছে। আজকের প্রথম কথাই হল গোল-এর যে আয়তনটুকু অর্থাৎ বার এবং পোস্ট-য়ের মধ্যেকার ফাঁকা অংশটুকু সামলাতে গিয়ে বারের নীচে দাঁড়িয়ে লম্ফঝম্প করলেই পুরোপুরি হয়না। অনেক সময় গোল ছেড়ে এগিয়ে গিয়েও পরিস্থিতি সামলাতে হয়। কয়েকটি ঘটনার কথা শুনলেই তোমরা বুঝতে পারবে। ১৯৭৮য়ের বিশ্বকাপ ফাইনাল তোমরা নিশ্চই টেলিভিশনে দেখেছ। মনে করতে পার কি সেই মুহূর্তটির কথা? চোদ্দ নম্বর জার্সি পরা আর্জেন্টিনার 'লুকে' একটি বল নিয়ে যখন হল্যাণ্ডের পেনাল্টি বক্সের কাছে এসেছেন তখন হল্যাণ্ডের প্রায় সব ডিফেণ্ডাররাই পরাস্ত। লুকে শুধু শট মেরে গোলটি করবেন। কিন্তু এই সময়টুকু লুকে-কে দিলেন না হল্যাণ্ডের গোলকীপার। প্রচণ্ড গতিতে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পেনাল্টি বকসের মাথায় এবং ঝাঁপিয়ে পড়লেন লুকের পায়ে। তাড়াহুড়োয় লুকে বলটি বাইরে পাঠাতে বাধ্য হলেন। আর একটু দেরী হলেই গোল হতে পারত।

১৯৭৫ সালে কলকাতা লীগে ইস্টবেঙ্গলের সাথে জর্জ টেলিগ্রাফের খেলায় জর্জের শম্ভু মৈত্র একটি ডিফেন্স চেরা পাস করলে মুনীশ মান্না প্রচণ্ড গতিতে দৌড়ে যায় সেই বল ধরে গোল করার জন্য। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের গোলকীপার তরুণ বোস তার চেয়েও বেশী গতিতে গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে মুনীশের আগে বলের কাছে পৌঁছলেন এবং লম্বা শট মেরে বিপদমুক্ত করলেন। পেনাল্টি বক্সের বাইরে চলে এসেছিলেন বলে বল হাতে না ধরে পায়ে মারলেন।

এই দুটো ঘটনার কথা শুনলে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার বোঝা যায় না কি, যে গোলকীপার খেলতে গেলেও খুব জোরে দৌড়ানোর দরকার। অনেকে ভাবেন বুঝি গোলকীপাররা তো দাঁড়িয়েই থাকে। কিন্তু আমরা তো জানি আসলে তা নয়, কি বলো? তাই জোরে দৌড়ানো কিন্তু আর সব জায়গার খেলোয়াড়ের মতো গোলকীপারকেও অনুশীলন করতে হবে। তবে গোলকীপারের দৌড়ানোর মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, আর তা হোল, সব সময় দাঁড়ানো অবস্থা থেকে হঠাৎ জোরে দৌড়ানো। গোল পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে গিয়ে হঠাৎ পরিস্থিতি বুঝে দৌড় লাগাতে হয়। ভাল ভাল বাড়ীতে দেখতে পাবে বাড়ীর বাইরে চারদিক দিয়ে দেওয়াল তুলে ঘিরে দেওয়া আছে। বাড়ীটাকে আগলানোর জন্যই তো এই ব্যবস্থা। চোর বাড়ীর ভেতর ঢোকা তো দূরের কথা, ওই দেওয়ালের এপারে যাতে না আসতে পারে তার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একটি গোলকীপারের কাছেও পেনাল্টি বক্সের সীমানাটি হল কম্পাউণ্ড ওয়াল। গোল পোস্টের চেয়ে যত দূরে বিপক্ষকে আটকানো যায় সে চেষ্টাই করতে হবে। তাই বিপদের গন্ধ পেলেই গোলকীপারকে পোস্ট ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে অনেক আগেই বাধা সৃষ্টি করতে হয়। ঠিক যে ধরণের অনুশীলন এর জন্য প্রয়োজন তা গোলকীপার নয়, সব জায়গায় খেলোয়াড়রাই করতে পারে। কারণ দ্রুত গতির অনুশীলন কার না দরকার, নির্দিষ্ট একটি দূরত্ব ঠিক করে নিয়ে সেটি বার দশেক খুব জোরে দৌড়ে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেকটা দৌড় শুরু করার সময় বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে হবে। কখনও বসে, কখনও শুয়ে, কখনও হাতের ওপর ভর রেখে শুয়ে, কখনও হয়ত বা বিভিন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে। এই অবস্থা থেকে হঠাৎ দৌড় শুরু করলে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম ক'রে আবার শুরুর জায়গায় ফিরে আসতে হবে।

এতগুলো শারীরিক সক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে একজন ভাল গোলকীপারের যে গুণ থাকা দরকার তা হল প্রখর বুদ্ধি। এর সাথে গলায় জোর থাকলে আরও ভাল হয়। অবাক হয়ে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, কেন? কারণ গোলকীপার যেখানে দাঁড়ায় সেখান থেকে পুরো মাঠটা চোখের সামনে থাকে। খেলার গতি কখন কিভাবে কোথায় যাচ্ছে তা পরিস্কারভাবে দেখার সুযোগ সবচেয়ে বেশী পায় গোলকীপাররা। সুতরাং নিজেদের খেলোয়াড়ের ভুল ত্রুটি শুধরে দেওয়ার ভার সাধারণত গোলকীপারের ওপরই থাকে। জাপানের কোনও দলের খেলা কোনদিন দেখার সুযোগ হলে দেখতে পাবে খেলা চলাকালীন মাঝে মাঝে বিকট চিৎকার করে গোলকীপার নিজের দলের খেলোয়াড়দের ভুল শুধরে দেয়। এবং এই চিৎকার সমস্ত গ্যালারী থেকে শুনতে পাওয়া যায়। অনেক খেলায় দেখা যায় যে গোলকীপাররা হাত পা ছুড়ে অন্যান্য খেলোয়াড়দের বকাবকি করছে। সকলের হয়ত মনে হতে পারে যে এত চিৎকার করে বকুনি দেওয়ার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু গোলকীপার জানে এবং যাকে বলা হচ্ছে সেই খেলোয়াড়ও জানে, এর প্রয়োজন আছে।



ধরা যাক, কোনও দলের রাইট ব্যাক বল ধরে এগোতে গিয়ে দেখল যে সামনে এগোনো যাবে না। তাই হঠাৎ ঘুরে গোলকীপারকে ব্যাকপাস করতে গেল। এই সময় বিপক্ষের রাইট আউট দৌড়ে আসছে কি না তা সেই রাইট ব্যাকের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। কারণ রাইট আউট তার থেকে অনেক দূরত্বে আছে। গোলকীপার কিন্তু ঠিক দেখতে পাবে বিপক্ষের রাইট আউটকে এবং সাথে সাথেই চিৎকার করে রাইট ব্যাককে পাস্ করা থেকে বিরত করতে পারবে। এক্ষেত্রে গোলকীপার যদি চিৎকার না করে তাহলে নিশ্চয়ই বিপদের সম্ভাবনা থাকে, নয় কি?

১৯৭৮ সালে লীগের খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে চিন্ময়ের একটা ব্যাক পাস মানস গোল করে দেয়। খেলার পর ভাস্কর এসে বলল, "কিরে চিন্ময়, চিৎকার করে বারন করলাম, তাও ব্যাক পাসটা করলি কেন? মানস আসছে

তা তো আমি আগেই দেখেছি।" চিন্ময় তখন কোনও উত্তর দেয়নি ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পর বলেছিল। আসলে বিদেশ এমনভাবে ওকে তাড়া করে যার ফলে কোনও চিৎকারই আর ওর কানে যায়নি। তোমরা যারা গোলকীপার তারা কিন্তু সবসময় গোলকীপারের কথা শোনার চেষ্টা করবে। কারণ গোলকীপাররা পুরো মাঠের খেলা সবচেয়ে ভালভাবে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে।

গোলকীপারের আর একটা বিশেষত্ব আছে। গোলকীপারের শুটিং আর অন্যান্য খেলোয়াড়ের শুটিংয়ে তফাৎ আছে। গোলকীপার হাতে বল নিয়ে ভলি বা হাফভলি মারতে পারে। আমরা, যারা মানে গোলকীপার নই, তারা তো তা পারে না। দূর থেকে দেখে ব্যাপারটা একটু সহজ বলেই মনে হয়। মনে হয় আমাকে যদি হাতে বল নিয়ে মারতে দেওয়া হয় তাহলে কত দূরই না পাঠিয়ে দেব। ব্যাপারটা কিন্তু আসলে অত সোজা নয়। তরুণ বা ভাস্করের মতো এত বড় বড় গোলকীপারদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে ওরা এখনও ঠিক মতো ভলি শট মারতে পারে না, অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু দূরে পাঠালেই তো আর চলবে না, সতীর্থ খেলোয়াড়ের কাছে পৌঁছতে হবে তো। প্রদীপদা আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন, কোনও এক জগৎ বিখ্যাত দলের সাথে খেলার। সম্ভবত দলটি ছিল হাঙ্গেরীর। অবশ্য ঠিক মনে করতে পারছি না, যাই হোক এই খেলায় প্রদীপদা একটা গোল করেছিলেন। গোলের জন্য প্রদীপদাকে বল পাস করেছিল কে জানো? ব্রজরাজ, আমাদের সেই লম্বা গোলকীপার। উনি এত ভাল শট মারতে পারতেন বা হাতে করে ছুঁড়েও এত ভাল বল পাস করতেন যে তার থেকে গোল হবার সম্ভাবনা থাকত। তাহলেই বুঝে দেখো, উনি গোলকীপার হয়েও আক্রমণের কাজটি প্রায় একজন ফরোয়ার্ডের মতনই করতেন। প্রদীপদা বলেছিলেন, খেলা তখন সমান সমান। বিপক্ষের প্রায় সব খেলোয়াড় আমাদের গোল দেবে বলে উঠে এসেছে। ভারতীয় দলেও তখন বাঘা বাঘা ডিফেন্ডার, ওরা কিছুতেই পেরে উঠছে না। এরই মধ্যে ব্রজরাজের হাতে বল যেতে ও আমায় দেখেই উঁচু করে শট মেরে বল পাঠিয়েছে। আগেই বলেছি তখন বিপক্ষের প্রায় সব ডিফেন্ডারই উঠে গেছে। আমার গোল করতে তাই বেশী অসুবিধা হয়নি। হাতে বল নিয়ে ভলি বা হাফভলি মেরে যে কোনও একটা লক্ষ্য স্থির করে সেখানে পাঠানোর অনুশীলন করলে সব গোলকীপাররাই একাধারে আক্রমণের উৎস হয়ে উঠতে পারে।

কেউ কেউ আছে গোলকীপারের দায়িত্বের ফিরিস্তি শুনেই বলে আমি গোলকীপার হবো না। আবার অনেকে বলে, দূর, বেশীর ভাগ সময়ই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কখন একটা বল আসবে তার জন্য। গোলকীপার না খেলাই ভাল। আবার কেউ বলে, দূর, সারাক্ষণ ভাল খেলে যদি একটু ভুলে একটা গোল খাই তাহলেই হল—যত দোষ সব গোলকীপারের। তার চেয়ে বাবা গোলকীপার না হওয়াই ভাল। এইরকম নানা কারণ আছে যা একটি ছেলেকে গোলকীপার হওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত করে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে ফুটবলে গোলকীপারের জায়গা কত দামী এবং প্রয়োজনীয়।

কোনও ফুটবল ম্যাচ গোলকীপার ছাড়া শুরু হতে পারে না। খেলা চলতে চলতে কোনও খেলোয়াড়কে যদি মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে পরিবর্তে কেউ নামতে পারবে না। কিন্তু যদি গোলকীপারকে বের করে দেয়া হয় তাহলে বাকী দশজন খেলোয়াড়ের কোনও একজনকে গোলকীপার হিসেবে দাঁড়াতে হয়। কারণ গোলকীপার ছাড়া কোনও ফুটবল খেলা হতে পারে না। তাহলে বুঝতে পারছ, অন্যান্য জায়গার চেয়ে গোলকীপারের জায়গাটা বেশী প্রয়োজনীয় কিনা। সবচেয়ে বড় কথা হল বিপক্ষের সমস্ত হামলা শেষ পর্যন্ত সামাল দেয় গোলরক্ষক। গোল রক্ষা করার জন্য যে কোন দলের শেষ ভরসা হল গোলকীপার। তাই তাদের মাঠে আলাদা জার্সি পরানো হয় যাতে লোকে বুঝতে পারে যে মাঠের অন্যান্য খেলোয়াড়ের সাথে এই খেলোয়াড়টির পার্থক্য আছে। তোমরা যদি কখনও সনৎ শেঠ, প্রদ্যোৎ বর্মন, তরুণ বোস বা ভাস্করের সাথে কথা বলো, তাহলেই বুঝতে পারবে, শুধু মাঠের ভেতরেই নয়, বাইরেও এরা অন্যরকম, সবার চেয়ে আলাদা, সবার চেয়ে ভাল।

গোলকীপার সম্বন্ধে যে সব আলোচনা আমরা করলাম তা নিশ্চয়ই তোমাদের ভালো লেগেছে। এই আলোচনায় গোলকীপিং কতটুকু শেখা যাবে আমি জানিনা। তবে গোলকীপার হতে যে ইচ্ছে করবে বা গোলকীপার হওয়ার জন্য যত বেশী অনুশীলনই করতে হোক না কেন, অনেকে রাজী হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সত্যি কথা শুনবে, তরুণ বোসের ইচ্ছে হয়েছিল গোলকীপার হওয়ার। ভাস্করেরও ছোটবেলায় ইচ্ছে ছিল ভাল গোলকীপার হবো। আর তোমরা যদি ইচ্ছে করো হতে পারবে না তা কি হয়? কিন্তু তোমরা ভাল ভাল গোলকীপার হলে আমরা গোল দেব কি করে? সে আমরা একটা কিছু ঠিক ভেবে বের করব। রইল বাজী, তোমরা ভাল ভাল গোলকীপার হও, আর আমরা হবো ফরোয়ার্ড। আমরা গোল দিতে পারি, না তোমরা আটকাতে পারো, দেখা যাক্।

## উদ্ধৃতি

"বয়স বেড়ে যাওয়ায় এবং শরীর সম্পূর্ণ সক্ষম না থাকায় আমার পক্ষে আর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। তাই অবসর নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবশ্য, ফুটবলের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখতে চাই বলে ক্লাব ফুটবল থেকে বিদায় নিচ্ছি না।"

—সুরজিৎ সেনগুপ্ত

"আমি ভাবতেই পারিনি যে সমর ভট্টাচার্যর মতো তরুণেরাও ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাবে।"

—পি কে ব্যানার্জি

"প্রদীপ প্রতিজ্ঞা করেছে, যারা থাকল তাদের নিয়েই শক্তিশালী ভারতীয় দল তৈরি করবে এবং দু'বছর পরে বাংলার স্টারদের অনুশোচনা হবে।"

—অশোক ঘোষ

"আমি অনুভব করেছিলাম, যেন একটা বিরাট গর্তে হামাগুড়ি দিচ্ছি। ভাবতে ইচ্ছে করছিল, যেন আমি কোনদিনই এই মহান খেলাটি খেলিনি। একদিনের ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে। আর মৃতদেহের সঙ্গে গ্রেগ চ্যাপেলকেও কবর দেওয়া উচিত।"

—কিথ মিলার

(নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রেগ চ্যাপেলের নির্দেশে ট্রেভর চ্যাপেলের কুখ্যাত আণ্ডার আর্ম বলটি প্রসঙ্গে।)

"মেলবোর্নে দ্বিতীয় ইনিংসে কিরমানি উডকে যেভাবে স্টাম্প আউট করেছে, তারপর আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে স্পিন বোলিংয়ে কিরির চেয়ে ভাল উইকেটকীপার কখনও দেখিনি। আমি অ্যালেন নটের কথা মনে রেখেও এই মন্তব্য করছি।"

—ইয়ান চ্যাপেল

"ওরা তিনজন কেন বড় টেনিস খেলোয়াড়? বর্গ — কারণ সে ম্যাচ জিতে চলেছে, কারণ সে কোনো শট মিস করেনা, কারণ তার মনঃসংযোগ অসাধারণ। ম্যাকেনরো — কারণ তার সার্ভিস দুর্দান্ত, এবং ভলি খুব ভাল। কোনরস — কারণ সে প্রচণ্ড জোরে বল মারে এবং সবসময়ই আক্রমণাত্মক।"

—আইভ্যান লেণ্ডল

"আশির দশকের টেনিসকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করবে আইভ্যান লেণ্ডল।"

—জিমি কোনরস

# ক্রিকেট এবং ক্রিকেট

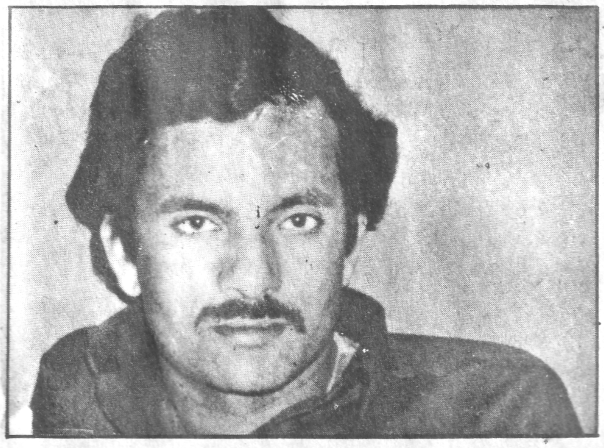
## অলক চট্টোপাধ্যায়

ষাট, ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থে এখন সমস্ত ভারতীয় ক্রিকেটরসিকদের একটাই প্রার্থনা হওয়া উচিৎ যেন বিশ্বনাথ ঘন ঘন টেস্টে সেঞ্চুরী করেন। কারণ এছাড়া অন্য কোন ঘটনায় বোধহয় ভারতের ক্রিকেট সম্মানরক্ষা সম্ভব নয়। কেন একথা বলছি? বলছি এজন্য যে, বিশ্বনাথের সেঞ্চুরীই বার বার শুভ লক্ষণ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে- এবং হচ্ছে শেষতম উদাহরণ, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ণ টেস্টে জয়)। টেস্টে এ পর্যান্ত (১২/২/৮১) বিশ্বনাথ মোট ১২টি টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন এবং তার মধ্যে একটিতেও ভারত হারেনি, চারটি জিতেছে এবং আটটি ড্র হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে অন্য একটা দুর্ভাগ্যজনক অভ্যাস (অভিশাপ?) কে খণ্ডন করার একমাত্র কৃতিত্বও ঐ বিশ্বনাথেরই। টেস্টে প্রথম আবির্ভাবে যে সব ভারতীয় সেঞ্চুরী করেছেন তাঁরা পরবর্তী টেস্ট জীবনে র শতরানের মুখ দেখেন নি, (খুব সফলও হয়েছেন কি?) ব্যতিক্রম কেবল বিশ্বনাথ। সুতরাং পৃথিবীর কোথাও ভারত টেস্ট খেললেই আমরা সমস্বরে স্লোগান দেব — 'জয় বাবা বিশ্বনাথ'। সেঞ্চুরী চাইই চাই।

একমত্রি গ্রিমি উডকে এখন অস্ট্রেলিয়ার একনম্বর ওপেনিং ব্যাটসম্যান বলতে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি হবে না, ভারত ও নিউজিল্যাণ্ড উভয়ের বিরুদ্ধে একটি করে সেঞ্চুরীসহ মোটামুটি সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন উড (মজার কথা হচ্ছে, গত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে তাকে অধিকাংশ লোকই ডেকেছেন ব্যারী উড নামে)। ২৫ বছর বয়সী তরুণ উডেরও কয়েকটি কুসংস্কার আছে। যেমন বেশির ভাগ ক্রিকেটারদের থাকে সেটা হচ্ছে প্যাড পরার সময় প্রতিবারই বাঁ পায়ের প্যাড আগে পরা। এছাড়া ব্যাট করার সময় আরো একটা মজার অভ্যাস উডের আছে — নন স্ট্রাইকার হিসেবে বুট দিয়ে রিটার্ন ক্রিজে আঁচড় কাটা। প্রশ্ন হচ্ছে. উইকেটে থাকার বাসনাই কি পা দিয়ে গণ্ডি কাটার অভ্যাসে প্রতিফলিত?

বাষট্রি মানুষের চেহারা যেমন তাকে অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার করে, আবার তাকে অনেক সময় অস্বস্তিকর বিপদেও ফেলে। অন্তত ইংল্যাণ্ডের উইকেটকীপার রয় সোয়েটম্যানের ক্ষেত্রে একথা মানতেই হবে। ১৯৫৮ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ইংল্যাণ্ড দল পিটার মে'র নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে জাহাজে। সোয়েটম্যানের চেহারা যথেষ্ট বড়সড় বা পেশীবহুল ছিল না এবং তাকে একটু পরিণত কিশোরের মত দেখাতো, যদিও তখন তার বয়স ২৫। একদিন সকালে একটু শিশুসুলভ ভঙ্গিতে সোয়েটম্যান লম্বা লম্বা পা ফেলে জাহাজের ডেকে বেড়ানোর সময় একজন বয়স্কা ইংরেজ মহিলার সম্মুখীন হলেন — 'এক্সকিউজ মি ইয়াংম্যান, তোমাদের পরিবার কি অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসের জন্য যাচ্ছে?' সোয়েটম্যান তখন সবিনয়ে জানালেন যে, তিনি ইংল্যাণ্ড টীমের একজন সদস্য, অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছেন। মহিলা অকপটে স্বীকার করলেন যে; তিনি সোয়েটম্যানকে কোন সিনিয়র ক্রিকেট প্লেয়ারের ছেলে হিসেবে ভেবেছিলেন। পরিস্থিতি সামলে সোয়েটম্যান পা বাড়াবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু মহিলা সহজে ছাড়ার পাত্রী নন। তাঁর পরের সান্ত্বনা বাণী বেরিয়ে এল — 'তোমার এই দীর্ঘ বিদেশ সফরের জন্য তোমার মা নিশ্চয়ই চিন্তিত আছেন'— এর পর সোয়েটম্যানের পক্ষে উত্তরটা খুব সবিনয়ে দেওয়া সম্ভব হলনা — 'আমার মা বোধ হয় খুব বেশী চিন্তিত নন, বরঞ্চ আমার স্ত্রীই একটু বেশী চিন্তিত। বলাই বাহুল্য, প্রবীণা মহিলাটি আর কোন প্রশ্ন করেননি।

# আমার প্রিয়



| | |
|---|---|
| ফুটবলার | KAVIN KEGAN ENGLAND<br>কেভিন কীগান |
| ক্রিকেটার | V. Richards (W. INDIES)<br>ভি রিচার্ডস |
| কোচ | GIAN PARKASH<br>জ্ঞানপ্রকাশ |
| বন্ধু | JASBIR Singh<br>যশবীর সিং |
| গায়ক/গায়িকা | Makesh<br>মুকেশ |
| অভিনেতা/অভিনেত্রী | JAYA BHADURI / PRAN<br>জয়া ভাদুড়ী / প্রাণ |
| লেখক/লেখিকা | Robert Ludan<br>রবার্ট লুডান |
| খাদ্য | MAKI-ki-Roti SAG<br>মাখন মেশানো রুটি ও শাক |
| হবি | Collecting latest GAZALS TAPES<br>সর্বাধুনিক গজলের 'টেপ' সংগ্রহ করা |
| উঠতি খেলোয়াড় | ARUNLAL<br>অরুণলাল |
| | Madan Lal |

# ● "আজ আমার খুশির দিন" — মনজিৎ সিং

/ প্রদীপ নাগ

একটি ঘোষণা। দিল্লীগামী উৎকল এক্স-প্রেস আসতে যথারীতি একঘন্টা দেরি হবে। কটক স্টেশনে রাতের দশটা। কিছু অত্যুৎসাহী গুণগ্রাহীর প্রশ্রয়ে, সন্তোষ ট্রফির কাপটি উপ-চেপরা মদীরায় পূর্ণ হয়ে জাতীয় ফুটবলের স্বাস্থ্যপানের যজ্ঞটি তখন প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছে। মাঝেমধ্যে বিজয় উৎসব ঘিরে উৎকট উচ্ছ্বাসের বেপরোয়া, বেশরম নগ্ন অবয়বটি বেআবরু হয়ে উঠছিল — উপস্থিত একরাশ সহযাত্রীর বিরক্তিকর গ্লানির মধ্যে।

'কেয়া ভাইসাব'—পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে সচকিত হতেই দেখি, মাঠের সেরা, ফাইনালে ফলাফল নির্ধারক নিজেই এত কাছে। শিল্প কর্মটির রূপকার (মনজিৎ সিং)—সেই লোকটি।

—কী ব্যাপার ? মাঠের ভেতর ছাড়া তোমার দেখা পাওয়া ভার। কোই কসুর হয়াতো মাফ্ কর লেনাজী। তোমাদের কাগজের ক্যামেরাম্যান আমার দোস্ত্। শান্তি-বাবুদাদা জানিয়েছিলেন তুমি ইন্টারভিউ নিতে আসবে। কই ?

—ভাবছি ওসব সখের লেখাটেখা ছেড়ে দেব। অনেক শুভানুধ্যায়ী কর্তাই পছন্দ করেন না।

—সে কী! প্লেয়ার, কোচ, মায় কর্মকর্তা—সব্ বাইতো এন্তার লিখছে বা বকছে এবং কিছু কামাচ্ছে। রেফারীরা কলম চালালে ক্ষতি কী ? তুমি সত্যি কথা লিখলেই তো হল।

চুপ করে আছি দেখে মনজিৎ সিং আমাকে একটা বড়সড় ঝাঁকুনি দিতেই প্রশ্ন ছল্‌কে উঠল।

—স্পোর্টস লাইনে থেকেও আমরা কেন জানিনা; সব সত্যকে স্পোর্টিংলি নিতে পারি না। মুখে অবশ্য বলে থাকি 'কল স্পেড এ স্পেড' বা স্পষ্ট কথা সামনাসামনি সোজা কথায় বলবে, ইত্যাদি। অথচ দেখা যাবে সামান্যতম সমালো-চনার গন্ধ, তা যতই উচিৎ বা গঠনমূলক ও সত্যভাষণযুক্ত হোক না কেন খুব অল্প লোক সেটা স্বাভাবিক ঔদার্যে গ্রহণ করতে পারেন। তাই লিখে আমার নিজের ক্ষতিই বেশী হচ্ছে।

—হোনে দো। অনেকদিন পর আজ আমার খুশির দিন এসেছে। আও, থোড়া দের-কে লিয়ে খাও, পিও আউর মজা উঠাও। আজ এক থাপ্পড় কোষেছি, বুঝলে। উঃ, কি আনন্দ! এরকম দিলখুশ মেজাজ এর আগে এসেছিল দুবার। সেই প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত শেষ যখন ব্যাঙ্ককে ৬ষ্ঠ এশিয়ানে (১৯৭০) আমরা ব্রোঞ্জ পেলাম জাপানকে হারিয়ে (১-০)। তার পরের সুখবর ঃ জলন্ধরে ন্যাশনালে (১৯৭৪ ফাইনালে বাংলার ঝুলিতে ছ' ছটা গোল ভরে দিলাম। আজ আবার আরেক বাংলাকে হারিয়ে প্রমাণ করলাম পাঞ্জাবের বাইরে গিয়েও আমরা সন্তোষ ট্রফি তুলতে পারি।

—কোচ সমেত অনেক খেলোয়াড় বাংলা থেকে এলেও রেল একটি সর্বভারতীয় দল। আমি বললাম, কেন জানিনা বাংলাগন্ধী দল থেকে বিজয়তিলক ছিনিয়ে নিয়ে তোমার এত খোশমেজাজ। আর তাই যদি হয় কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলে নাম লেখাতে গিয়েছিলে কেন ?

—লোকে কোচ হয় মাঠ ছাড়লে। আমি মাঝমাঠ থেকে পাতিয়ালায় কোচিং পাশ করে আবার বাকি খেলাধূলোয় ফিরে এসেছিলাম ইস্টবেঙ্গল থেকে পাওয়া বুকভরা প্রাণের আশ নিয়ে। কলকাতায় খেলব। সে যে কি আনন্দ মিশ্রিত আশঙ্কা তোমায় বলে বোঝানো যাবে না! ঐ ক্লাবে বহুদিন খেলেছে আমার বন্ধু, এশিয়া-শ্রেষ্ঠ ডিফেন্ডার, সুধীর কর্মকার যার বাড়ানো বলে আমি ভারতের বাইরে খেলেছি। ইস্টবেঙ্গল! মোহিনী ইস্টবেঙ্গল! আঃ নামটার সাথে মিশে ছিল রোমাঞ্চ ও মাদকতা। হায়রে ইতিহাস! তোমাদের বঙ্গভঙ্গের মত আমার জীবনে অতবড় আশাভঙ্গ—ইস্, আর কারোর যেন না হয়। ভাবতেও বিশ্রী লাগে। এই ক্লাবেই না সেদিনও খেলে গেল আমার কল্পনার বাস্তবায়িত রূপ—খাঁটি বল প্লেয়ার কাজল মুখার্জি। মেঘের পিঠে ভাসতে ভাসতে ময়দানী জেটিতে একদিন পৌঁছলাম—না থাক্, শয়তানগুলোর নাম করলেও পাপ হয়।

—ভুলে যাও, নিছক ভুল বোঝাবুঝি। উত্তেজনা কমাতে চাইলাম।

—জানো, আমরা বহিরাগতরা (মনজিৎ, গুরদেব, হরজিন্দার ও দেবরাজ) যাতে ঠিকমতো তোমাদের মন কাড়তে না পারি ভাল খেলে, তার জন্য চক্রান্ত করে জাল বিছানো হয়েছিল। যে ফাঁদে প্রথম বড় শিকার দেবরাজ। নিজেদের ঘরোয়া ঠাট্টা তামাশাগুলো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কি কাণ্ডটাই না বাধানো হোল শেষটায়। বেচারা পালিয়ে বাঁচে।

—আসলে তোমরা সকলে ফর্ম ধরে রাখতে পারছিলে কি ?

—পারছিলাম না ঠিকই। নতুন মাটিতে কিছু সময় তো দিতে হবে। গুরদেব সিং অবশ্য খানিকটা মুষড়িয়ে ছেলা হয়ে পড়েছিল। একটা সময় হরজিন্দার তো পায়ের ব্যাথায় কেবল ভুগলো। আর আমি তো ছিলাম ল্যাবোরেটরি। সময়ে হাফ-লাইনে, কখনো ফরোয়ার্ডে বা একটা অর্ধ খেলিয়ে আমাকে নিয়ে গিনিপিগের মতো এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। শীল্ডে কোরিয়ার দিন আমার নিজের জায়গায় পুরো খেলে দেখাতে চেয়েছিলাম আমি, আমিই। তোমরা যখন



খেলাবেই না...।

—বাদ সাধলো কে ?

—গোষ্ঠি কোন্দল, কোচ অরুণ ঘোষ এণ্ড কোং।

—ক্লাবের নিজস্ব ব্যাপারে আমি কোনরকম আলোচনায় যেতে চাইনা। তবে যে দু'জনার নাম তুমি করলে তাঁদের সম্পর্কে প্লেয়রাদের ধারণা কিন্তু অন্যরকম বলেই শুনি। যেমন অরুণ ঘোষ অতীব ভদ্রলোক, আর সুরজিৎ সেনগুপ্ত খুব...।

—থামাও। শোন তবে। প্রথমেই একদল রটিয়ে দিলে আমি একটা বুড়ো ভাম। তখন আমার চলছিল সাতাশ! ফেডারেশন কাপে যখন আটাশ, ইডেনে খানিকটা দেখিয়েছি কেমন বৃদ্ধ আমি হয়েছি। আর আজ উনত্রিশতম বসন্তে ফোকলা দাদু হয়ে দিব্যি নব্বুই মিনিট কেমন লড়ে যাচ্ছি কচি খোকনদের সাথে। যৌবন তাহলে ফিরে পেলাম বলো। অপপ্রচার, বুঝলে—সব অপপ্রচার।

এমন সময় রেফারি দিলীপ সেন পেয়াদা পাঠিয়ে বুঝিয়ে দিলেন প্লাটফরমের আরেক প্রান্তে সকলের মালপত্র নিয়ে একলা পাহারাদারি করা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। মনজিৎ সিং এমন বঙ্গসন্তান কাম নিরুপদ্রব শ্রোতা হাতছাড়া করতে নারাজ। এরকম হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন

ওয়েটিং রুমের দিকে।

—অরুণদাদা লোক ভালো হলে কি হবে পারসোনালিটি থাকলেও কাজে লাগাতে পারেন না। অন্যদের প্ররোচনায় আমাকে ব্যবহার করতে পারেন নি। অনেকদিন আমাকে সাইডলাইনে বসিয়ে রেখেছেন। বুট পরিয়ে ফের খুলিয়ে রাখার মতো।

—আগেও তো কত ভিন্ রাজ্যের খেলোয়াড় খেলে গেছে...

—কিন্তু তখন কেন এসব হোতনা? ভায়া, কাল ও আজে বহুত ফারাক এখন।

—কল্পনা কর, তোমাকে ইস্টবেঙ্গল এবছর ফের অনুরোধ করেছে। যাবে তো?

—নেহি, কভি নেহি। অ্যাঁ, অ্যাঁ,—হ্যাঁ—লেকিন কেয়া মালুম।

এমন সময় উঁকি মেরে গেলেন সর্বভারতীয় সংস্থার 'প্রতিভা সন্ধানী' কাজে নিযুক্ত প্রশান্ত সিন্‌হা এবং পরিদর্শক মানব দত্ত। অদূরে আনন্দোৎসবের টলটলায়মান মৌতাত অবস্থা দুজনকে দ্রুত ঐ স্থান থেকে দূরে নিক্ষেপ করল। মনজিতের সচঞ্চল চোখে পড়ে গেলেন ওরা। মনজিৎ অপেনমনেই বলে চলল: কলকাতার অন্তত দুটি লোককে চিরকাল শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে যাব অন্তরের অন্তস্থল থেকে। প্রশান্ত সিন্‌হা আমাকে অর্থও পাইয়ে দেন নি বা টীমে ভাল স্থান দেবার অঙ্গীকারও করেননি, এটা আগেই বলে রাখছি। ওর মতো ক্লাব পলিটিক্সমুক্ত এমন ইস্টবেঙ্গলপ্রেমী লোক আমি জীবনে দেখিনি। আমি ওনার মার্জিত আচার, আচরণ এবং অনুকরণীয় খেলোয়াড়ী ব্যবহারের কাছে চিরঋণী থাকব। আরেকজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মোহনবাগানের শৈলেন মান্না। উনি তো মোহনবাগান ক্লাবের ট্র্যাডিশনার চিরপ্রতীক।

—ভাঙাচোরা বাংলা দল কেমন মনে হল?

—বাংলার সনাতন টেকনিক্যাল খেলা আর নেই। বল প্লেয়ার এখন বিরল। গ্ল্যামারটুকুই আছে। কেমন যেন খাপছাড়া দায়সারা গোছের বাংলা দলকে দেখলাম। অবশ্য সামনের কয়েক বছর পাঞ্জাবেও ভালো খেলোয়াড়ের ঘাটতি দেখা যাবে।

— ফাইনালে তুমি অন্তত বাংলার রেফারিদের সাথে খেলেছ। কেমন লাগল?

— খারাপ লাগার প্রশ্নই নেই আমিতো দিলীপ সেনকে পেতে চেয়েছিলাম।

—কিন্তু রবি চক্রবর্তীর নাম নিয়ে বাধা দিলে কেন?

—শুনেছি ম্যানেজার কেশকৃপাল সিংকে উস্‌কানো হয়েছিল। রেল ছিল একটা প্রায় বাংলা দল। রেফারিরাও তাই। তাঁর ওপর রবিবাবু পোর্টে কাজ করেন। সেখানকার কয়েকটি প্লেয়ার রেল দলে আছে। বোধহয় তারই জন্য। এছাড়া বাঙালী রেফারি নিয়ে আপত্তির অন্যকোন কারণ থাকতেই পারে না।

—ইন্দার সিং কেমন আছেন?

—ভাল। ওঁর সাথে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে জে সি টিতে এসেছি। ও আমার এখন কাছের বন্ধু। ইন্দারের পায়ের শিরায় একটা চোট থেকে রক্তপ্রবাহে ব্যাঘাত দেখা দিয়েছে। আশা রাখি, সেরে উঠলে পুরো ফিট হবে। তখন যদি কলকাতার শীল্ডে যেতে পারি তবে আমার প্রৌঢ়ত্বের একটা বড় মাপের ছাপ রেখে আসতে পারব বোধহয়। অবশ্য মনে রাখতে হবে, ইন্দার এখন আটত্রিশ বছরের যুবক।



—তোমার মতে এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড লাইন আপ কিরকম হওয়া উচিৎ?

—হরজিন্দার সিং ছাড়া ফরোয়ার্ড লাইনে নাম করার মত কেউ নেই। আমাকে তো কলকাতা থেকে খারিজ করা হয়েছে।

—তুমি কুশলী প্লেয়ার হয়েও বেশীক্ষণ বল ধরে রাখ কেন? এতে তোমার টীমের ক্ষতি হয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

—পণ্ডিতদের মতামতকে সম্মান জানিয়েই বলছি, বল কন্ট্রোল একটা আর্ট। ড্রিবল করার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ভাল গোল ওপেনিং তৈরী করা অথবা সতীর্থদের এমন উপযুক্ত জায়গা নিতে সময় দেওয়া যেখানে বল পাঠালে ভাল মুভ হবার সম্ভাবনা আছে। হাফ স্কিলড্ দলে বড়জাতের খেলোয়াড়ের অভাব আমাকে প্রায়ই বাধ্য হয়ে ড্রিবল করতে হয় সময় ও সুযোগের অপেক্ষায়। তোমরা বাপু যাই বল, ড্রিবলিংও বলকে শীল্ড বা আড়াল করে খেলে অপরকে ধরতে না দেওয়া আমার জন্মগত দক্ষতা। আমি আমার বৈশিষ্ট্য বর্জন করত পারব না। সেটা ইচ্ছা করলেও নরেন্দ্র গুরুংয়ের পক্ষেও ছাড়া সম্ভব নয়।

—দিল্লি এশিয়াডে তোমাকে আশা করতে পারি তো?

—তোমরা বড় বেরসিক। বুড়ো বানিয়ে রিটায়ার করাতে চাইছ, অথচ বিয়ে দিচ্ছ না। তাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ঐ পাটটা চুকিয়ে ফেলতে চাই। এরপর ফেডারেশন মনোনীত করলে ক্যাম্পে যাব নিশ্চয়ই।

—প্লেয়ারদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি পরিকল্পনা আগের তুলনায় কেমন মনে হচ্ছে?

— আমাদের দেশে অবশ্যই প্রায় দু' বছরের ধারাবাহিক প্ল্যান্ড, ট্রেনিং ব্যবস্থা একটা অভিনব ব্যাপার। বর্তমান কাঠামোয় মনে হয় এটাই শ্রেষ্ঠ উদ্যোগ

হারান পুত্রের হঠাৎ হদিশ পাবার মত উচ্ছলতায় পাঞ্জাব বাহিনী মনজিতকে আমার খপ্পর থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ওদের সাজানো জলসাঘরে। ওখানে তখন রং বেরঙের মজলিশে আনন্দের ফোয়ারা।

# স্টার অ্যাণ্ড সুপার স্টার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এই ধরনের ছবির দরকার আছে। যদিও টুকরো টুকরো কিছু মুহূর্তকে জোড়া লাগিয়ে এ ছবির জন্ম এবং তাতে প্রকৃত ক্রিকেটপ্রেমিকের মন কিছুতেই ভরে না, তবুও এ ছবির প্রয়োজন। আমরা যেভাবে অনেক অনেক স্মরণীয় ক্রিকেট যুদ্ধকে শুধু বইয়ের পাতায় স্কোরকার্ডে লেখা কালো অক্ষরে আস্বাদ করা ছাড়া আর সর্বরকমে হারিয়েছি, উত্তরকালের ক্রিকেটরসিকেরা যাতে সেভাবে আর কোন ক্রিকেট দ্বন্দ্বকে না হারান, সেলুলয়েডের বুকে ধরে রাখা ছবিতে যাতে তাদের ইতিহাসকে জানার তৃষ্ণা মেটে, সে জন্যই এই ছবির প্রয়োজন আছে। দীর্ঘায়িত, আরও দীর্ঘায়িত হলে স্টার অ্যাণ্ড সুপারস্টার ছবিটা বোধহয় আরও একটু ভালো লাগত। আসল ছবির দৈর্ঘ্য কম, তাই ভিনু মানকাদের জীবনের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ডকুমেন্টারী দিয়ে সময় খানিকটা বাড়ানো হয়েছে। তাতে দর্শকেরাই এক অর্থে লাভবান হয়েছেন। ভিনুর জাদুকরী প্রতিভা সম্পর্কে অনেক কিছু জানানো ও দেখানো হয়েছে, যা সত্যিই আমাদের কাছে অপ্রাপনীয় ছিল। ছবিটির ফটোগ্রাফি কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্নমানের। সম্পাদনার কাজও সব জায়গায় ভালো হয় নি। একই শট অনেক জায়গায় বারবার দেখানো হয়েছে, যা দর্শকের কাছে সুস্পষ্টভাবে বিরক্তিকর লাগে। তবুও এ ছবি করার প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ, যিনি এ চিন্তা করেছেন, ব্যবসায়িক চিন্তা বাদেও তার ভাবনার স্রোত যে কিছুটা ক্রিকেটরসিকের মন ভরানোর খাতেও প্রবাহিত হয়েছে, এ জন্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। এ চেতনা প্রসারিত হোক। চেতনা আসুক অন্যান্য লোকের মনেও। তাহলেই আমরা কখনও, কোনও না কোনদিন দেখতে পাব 'স্যালুট টু সোবার্স'-এর মত অসাধারণ কোন ক্রিকেট-চিত্র, যা দেখার অপেক্ষায় আমরা দীর্ঘদিন নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় থাকতেও রাজী আছি।

———— নিজস্ব প্রতিনিধি

# প্রিয় সম্পাদক

## 'হায় বাংলা'—প্রতিবাদ

১লা ফেব্রুয়ারী সংখ্যার খেলার কাগজে অশোক দাশগুপ্তর 'হায় বাংলা' পড়লাম। ভালমন্দ মিশিয়ে লেখাটি বেশ মনোগ্রাহী। কিন্তু একটি ব্যাপারে আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি। বাংলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জির যে চিত্র আপনি এঁকেছেন, তা সত্যিই নিন্দনীয়। বড় খেলার আগে যে কোনো দায়িত্বপূর্ণ কোচের পুরোমাত্রায় টেনশন থাকে, তার বহিঃপ্রকাশ সকলের একরকম নয়। এ ব্যাপারে আপনি অহেতুক ব্যঙ্গোক্তি করেছেন। হতে পারে, অশোক মিত্রর খামখেয়ালীতে বাংলা শোচনীয় ফলাফল করেছে, কিন্তু সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করেও কোচ হিসেবে অচ্যুৎ ব্যানার্জির এগিয়ে আসা প্রমাণ করেছে, বাংলার প্রতি তাঁর আন্তরিকতার কথা। হয়ত কিছুটা নীতিবিরুদ্ধ কাজ হয়ে গেছে কিন্তু দুর্দিনে একমাত্র তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন প্রধান কাণ্ডারীর দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের জন্য। বাংলা তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের শ্রদ্ধেয় 'স্যার'-কে 'কমিক রিলিফ' হিসেবে অভিহিত করার জন্য খেলোয়াড়রাই আপনাকে অভিযুক্ত করতে পারে। সুরজিৎ-প্রসূনরাই অযথা তাদের স্যারের একটি অসাধারণ ইমেজ তৈরী করেছে—এ ব্যাপারে ওদের বক্তব্য থেকে কিরকম অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন, তা জানার আগ্রহ আমাদেরও রইল।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য কলকাতা-২৫

## অশোকবাবুর কলম থেকে...

'এরফান থাকতে মহমেডান টীম ভাঙবে না'—সরোজ চক্রবর্তীর এই লেখাটি পড়ে জানতে পারলাম যে, মহমেডানের কয়েকজন কর্মকর্তার অভিযোগ, পিন্টু চৌধুরী তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এবং সম্প্রতি টীম ভাঙার জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা শ্রদ্ধেয় পিন্টুদার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার কল্পনাই করতে পারি না। তাই এরকম একটি খবর বিশ্বাস করতে দ্বিধা হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে অশোক দাশগুপ্তর নির্ভীক কলম থেকে আমরা অনেক ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছি, তাই এই ঘটনার প্রকৃত সত্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করার জন্য অশোকবাবুকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি অশোকবাবু আমাদের নিরাশ করবেন না।

বন্দনা ও চন্দনা গুহ
হাওড়া-৪

## ধন্যবাদ ও ধিক্কার

ভারতের সর্বশেষ ফুটবল অধিনায়ক ও মোহনবাগান গ্যালারীর নয়নের মণি প্রসূন ব্যানার্জি অর্জুন পুরস্কার পাওয়ায় আমরা আনন্দিত। ওর যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওর বাঁ পা প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে কাঁপন ধরায়। শুধু ফুটবলারই নয়, মানুষ হিসেবে তার জুড়ি ভারতের ফুটবলারদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ব্যাপার। ওর তুলনা ও নিজেই। এই ভালো ব্যবহারের জন্য ইস্ট-মহমেডান গ্যালারীও প্রসূনকে বাহবা জানায়। অর্জুন পুরস্কার পাবার জন্য প্রসূনকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ধিক্কার জানাচ্ছি সেইসব প্রতিহিংসাপরায়ণদের, যারা প্রসূনের অর্জুন পুরস্কার পাওয়া আটকাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

খেলারাম ও বিকাশ সোম
বর্ধমান

## অভাবনীয় জয়

সদ্যসমাপ্ত মেলবোর্ণ টেস্টে ভারত অস্ট্রেলিয়াকে মাত্র ৮৩ রানে মুড়িয়ে দিয়ে অকল্পনীয় ভাবে যে জয়লাভ করল, তার কৃতিত্ব সব খেলোয়াড়েরই প্রাপ্য। অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর জন্যে সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই মাঠে নেমেছিলেন এবং তাদের সেই প্রতিজ্ঞাই অস্ট্রেলিয়ার ওপর খাঁড়ার মতো নেমে এসেছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪৩ রান করতে হবে, এই অবস্থায় কোন মহান আশাবাদী ভেবেছিলেন যে গ্রেগ চ্যাপেল, ডগ ওয়াল্টার্স, কিম হিউজ, অ্যালান বরডার সমন্বিত অস্ট্রেলিয়া দল মাত্র ৮৩ রানে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে? এবং তাও অধিকাংশ আহত বোলারদের সামনে? কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত নিলেন কারসন ঘাউড়ি পরপর দু' বলে ডাইসন এবং চ্যাপেলকে ফিরিয়ে দিয়ে, দোশী একপ্রান্ত থেকে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানদের নির্মমভাবে নিস্পেষণ করে এবং আহত কপিলদেব ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ব্যাটসম্যানদের শিকার করে। কিন্তু তার আগে বিশ্বনাথ তাঁর শিল্পমাধুর্যমণ্ডিত ১১৪ রান করে এবং চৌহান নির্ভরশীল ৮৫ রান করে ভারতকে জয়ের দিকে নিয়ে যায়। দুর্ভাগা গাভাসকারের, যখন তিনি ফর্ম ফিরে পাবার জন্য সংগ্রাম করছিলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ার দ্বাদশ খেলোয়াড় আম্পায়ার রেক্স হোয়াইটহেড তাঁর অঙ্গুলিহেলনে গাভাসকারকে প্যাভেলিয়নের পথ দেখিয়ে দেন।

এ অভাবনীয় জয় নিঃসন্দেহে ভারতের ক্রিকেটকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। আশা, এ জয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারত নিউজিল্যাণ্ডে ভাল ফল দেখাবে।

অনিলেন্দু ভট্টাচার্য
গৌহাটী, আসাম

## সত্যিই কি শ্রেষ্ঠ?

মেলবোর্নে দ্বিতীয় ইনিংসে (৭০) ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় সুনীল গাভাসকারের ব্যর্থতা আমাদের একটা বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছে। ভারতীয় দল সফরে যাবার আগে থেকেই আমরা সানিকে ঘিরে অনেক 'সুখস্বপ্ন' দেখেছিলাম। হায়! তার হতাশাজনক ব্যাটিং আমাদের নিরাশ করেছে। এই কি সেই ২৩টি সেঞ্চুরী করা সানি? সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে কাউন্টি ক্রিকেটে দারুণ খেলেছিলেন কি ঐ সানিই? অথচ এখন মনে হচ্ছে যে, তার ব্যাটিংয়ের মান অস্ট্রেলিয়াতে আন্তর্জাতিক মানেই পৌঁছয় নি। ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড সানির অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্টে গড় মাত্র ১৯.৬।।

এখন আমাদের মনে একটাই প্রশ্ন বারবার উঁকি দিচ্ছে, "গাভাসকার কি সত্যিই এখন শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান?"

তপু রাহা
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

## ফুটবলের গল্প ও......

আমাদের প্রিয় 'খেলার কাগজ' পত্রিকাতে প্রতি সংখ্যাতেই একটি করে 'ক্রিকেটের গল্প' থাকে। ছোট গল্পগুলো সত্যিই আমাদের মন দারুণভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু এই মুহূর্তে আর একটি আরজি না জানিয়ে পারছি না। ক্রিকেটের গল্পের সঙ্গে সঙ্গে আপনারা ফুটবলের গল্পও চালু করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বিভাগটিও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

প্রণবেশ সরকার
হাওড়া-১

## বিভ্রান্তি!

১৬ জানুয়ারী সংখ্যা খেলার কাগজে 'এই পক্ষে জন্ম' বিভাগে ঐ পক্ষের ক্রিকেটার শিবলাল যাদবের জন্ম তারিখ দেওয়া হয়েছে ২৩ জানুয়ারী। কিন্তু ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টের ধারাবিবরণীতে প্রত্যেক ধারাভাষ্যকার বারবার জানাচ্ছিলেন, নন্দলাল শিবলাল যাদবের জন্ম তারিখ ২৬ জানুয়ারী। উপরোক্ত তারিখের বিভ্রাটটি আমার মতো আরও অনেককে বিভ্রান্ত করতে পারে। তাই আমার অনুরোধ, পরবর্তী সংখ্যা 'খেলার কাগজ'এ যাদবের সঠিক জন্মতারিখ জানিয়ে বিভ্রান্তির অবসান ঘটান।

শান্তনু চক্রবর্তী
আমলাগোড়া

( আপনার মতো আরও অনেক বিভ্রান্ত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই, শিবলাল যাদব নিজেই আমাদের কাগজের প্রতিনিধি দেবাশিস দত্তকে জানিয়েছিলেন যে, তার জন্মতারিখ ২৩ জানুয়ারী। সুতরাং ধারাভাষ্যকারেরা ঐ তথ্যটি কোথা থেকে আবিষ্কার করেছেন, আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। )

## মাত্র একটি প্রশ্ন

জবাব দিচ্ছেন

### অশোক দাশগুপ্ত

**প্রদীপ কুমার সিংহ, রঘুনাথবাটী, বর্ধমান।**

**প্রশ্ন :** টেস্ট খেলা সর্বপ্রথম কোন কোন দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ? কোন মাঠে খেলা হয়েছিল ? দুই দলের অধিনায়কের নাম কি ছিল ?

**উত্তর :** ক্রিকেটের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে ( মার্চ ১৫-১৯ ) মেলবোর্ণে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ঐ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৪৫ রানে জয়ী হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ছিলেন জেমস্ লিলি-হোয়াইট এবং অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন ডি ডব্লিউ গ্রেগরী।

**প্রসেনজিৎ কোঙার, তারকেশ্বর, হুগলী।**

**প্রশ্ন :** ভারতের কোন বোলার টেস্ট ক্রিকেটে কত সালে, কার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছেন ?

**উত্তর :** টেস্টে ভারতের কোন বোলার এখনো পর্যন্ত হ্যাটট্রিক করেন নি।

**দেবাশিস শর্মা, রতীবাটি কোলিয়ারী, বর্ধমান।**

**প্রশ্ন :** ক্রিকেটার সেলিম দুরানী ও অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড সফররত ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার উইং কমাণ্ডার দুরাণী কি একই ব্যক্তি ?

**উত্তর :** না।

**অনিরুদ্ধ গুপ্ত, সিউড়ী, বীরভূম।**

**প্রশ্ন :** মনসুর আলি খান পাতৌদির টেস্টে সেঞ্চুরীর সংখ্যা কত এবং সর্ব্বোচ্চ রান কত ?

**উত্তর :** টেস্টে পাতৌদি মোট ৬টি সেঞ্চুরী করেছেন। সর্ব্বোচ্চ রান—অপরাজিত ২০৩—বনাম ইংল্যাণ্ড ( ৪র্থ টেস্ট—দিল্লী, ১৯৬৩-৬৪ )।

**তরুণকান্তি দাস, পাটুলী, রাণাঘাট**

**প্রশ্ন :** ভারতের বর্তমান অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার টেস্ট ক্রিকেটে কতগুলি ডবল সেঞ্চুরী করেছেন ? কার বিরুদ্ধে এবং কত সালে ?

**উত্তর :** গাভাসকার এ পর্যন্ত তিনটি ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন, প্রথম ডাবল সেঞ্চুরী—২২০, বনাম ওঃ ইণ্ডিজ, ১৯৭০-৭১। দ্বিতীয় ডাবল সেঞ্চুরী—২০৫, বনাম ওঃ ইণ্ডিজ, ১৯৭৮-৭৯। তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরী—২২১ বনাম ইংল্যাণ্ড ১৯৭৯।

**রাজকুমার দে, গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা-৪**

**প্রশ্ন :** ইয়ান চ্যাপেল কোন সালে কলকাতায় ব্যক্তিগত ৯৯ রানে কোন ইনিংসে, কার বলে আউট হয়েছিলেন ? তিনি কখন আউট হয়েছিলেন ? অর্থাৎ লাঞ্চের আগে না চা বিরতির আগে ?

**উত্তর :** ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের ৪র্থ টেস্টে কলকাতায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ( তৃতীয় দিন, ১৪ই ডিসেম্বর ) চা বিরতির ঠিক আগে ইয়ান চ্যাপেল ৯৯ রান করে বেদীর বলে স্লিপে ওয়াদেকারের হাতে ক্যাচ আউট হন।

**মানা, বাপন ও স্বপন, কল্যানী, নদীয়া।**

**প্রশ্ন :** ১৯৫৫-৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৫ম টেস্টে ভারতের পঙ্কজ রায় ও ভিনু মানকাদ প্রথম উইকেটের জুটিতে ৪১৩ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন—ঐ ইনিংসে ভারতের মোট রান কত ছিল এবং ঐ টেস্টের ফল কি হয়েছিল ?

**উত্তর :** ৫৩৭—৩ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড, ভারত ১ ইনিংস ও ১০৯ রানে জয়ী হয়েছিল।

**অমলেন্দু ঘোষ, চাঁদমারী, আসানসোল।**

**প্রশ্ন :** গাভাসকার দুই ইনিংসে কোন দেশের বিরুদ্ধে কোথায় কত সালে কোন মাঠে সেঞ্চুরী করেছেন ?

**উত্তর :** এ পর্যন্ত গাভাসকার টেস্ট ক্রিকেটে তিনবার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। ১ম বার—বনাম ওঃ ইণ্ডিজ, ১৯৭০-৭১ সালে, ৫ম টেস্টে—পোর্ট অফ স্পেনে ( ১২৪ এবং ২২০ ), ২য় বার—বনাম পাকিস্তান, ১৯৭৮-৭৯ সালে তৃতীয় টেস্টে করাচীতে ( ১১১ এবং ১৩৭) ৩য় বার—বনাম ওঃ ইণ্ডিজ ১৯৭৮-৭৯ সালে, তৃতীয় টেস্টে কলকাতায় ( ১০৭ এবং অপরাজিত ১৮২ )।

**সন্দীপন দে, গড়িয়া, কলকাতা-৮৪।**

**প্রশ্ন :** একনাথ সোলকার ভারতের হয়ে কটি টেস্ট খেলেছেন ? তার মোট রান কত ? কটা উইকেট পেয়েছেন এবং কটি ক্যাচ ধরেছেন ?

**উত্তর :** সোলকার মোট ২৭টি টেস্টে রান করেছেন—১০৬৮। এর মধ্যে একটি শতরান (১০২), ৬টি অর্ধশত রান আছে, ব্যাটিং গড়—২৫'৪২। মোট ১৮টি উইকেট পেয়েছেন। উইকেট প্রতি গড়—৫৯'৪৪, ক্যাচ ধরেছেন—৫৩টি।

## এই পক্ষে জন্ম



এ পক্ষের (১—১৫ মার্চ) ক্রিকেটার ভিভিয়ান রিচার্ডস। পুরো নাম আইজ্যাক্ ভিভিয়ান আলেকজাণ্ডার রিচার্ডস। জন্মগ্রহণ করেছেন ৭ মার্চ, ১৯৫২।

বাবা ম্যালকম্ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট না খেললেও তিন ছেলে ভিভিয়ান, ডোনাল্ড এবং মারভিনের ক্রিকেট খেলার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছেন।

স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রিচার্ডসের বিশেষ প্রতিভার কথা সবাই জানত। এ্যান্টিগুয়ার পক্ষে ক্রিকেট এবং ফুটবল—দুটো খেলাতেই রিচার্ডস অংশগ্রহণ করতেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই রিচার্ডস বোলারদের বেধড়ক ঠ্যাঙাতেন। এর ফলে ঐ ছোট্ট বয়স থেকেই রিচার্ডসের বেশ কিছু 'ফ্যান' হয়ে গিয়েছিল। রিচার্ডসের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং দেখতে গিয়ে প্রায়ই মাঠে ভীড় উপচে পড়ত। এরকম একটি খেলায় রিচার্ডসকে আম্পায়ার ক্যাচ আউটের সিদ্ধান্ত জানালে, রিচার্ডস আম্পায়ারের কাছে গিয়ে জানায়, বল ব্যাটে লাগেনি। আম্পায়ার সিদ্ধান্ত পালটাতে রাজী না হওয়ায় বেশ কিছু দর্শক মাঠে ঢুকে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে থাকে সবাই বুঝতে পারে, এরা রিচার্ডসের ফ্যান। এরপর দর্শকরা পিচের ধারে বসে 'No Vivi, No match' শ্লোগান দিতে থাকে। উপায় না দেখে স্থানীয় কর্মকর্তারা দর্শকদের দাবী মেনে নেন।

প্রত্যেকের অনুরোধে আম্পায়ার পুনরায় খেলা আরম্ভ করেন। উত্তরপর্বে রিচার্ডস্ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় দর্শকদের আনন্দ দেন। আসল ঘটনা কিন্তু অপেক্ষা করছিল। সেদিনের খেলার শেষে কর্মকর্তাদের মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, রিচার্ডস আগামী দু বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঘরোয়া ক্রিকেটের কোন আসরে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। দু বছর পর লিওয়ার্ডের হয়ে সফররত নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৮২ রান করে তিনি সবার মন জয় করে নেন।

—দেবাশিস দত্ত

# ॥ হায় গ্রেগ, তুমিও ॥

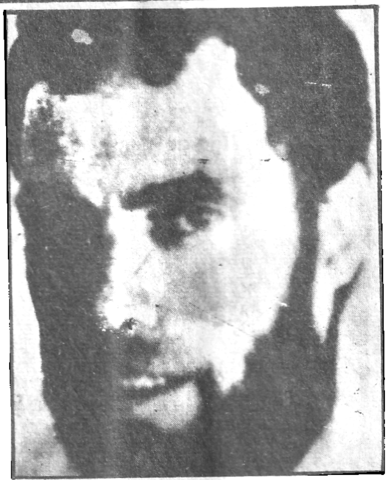
**—অশোক রায় ॥**

এক মহান ক্রিকেটারের অপমৃত্যুর কথাটাই যেন লেখা রইল কলঙ্কময় ঘটনাটিতে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বেনসন এণ্ড হেজেস কাপের ফাইনাল পর্যায়ের তৃতীয় খেলার শেষ বলটিতে খুব বেশী হলে একটি 'ছক্কা' এবং একটি উপভোগ্য 'টাই' ম্যাচের প্রত্যাশা করেছিল নিউজিল্যাণ্ড। ১০২ রানে অপরাজিত ব্রুস এডগারের অচঞ্চল ব্যাটও এর বেশী হয়তো আশা করে নি। তবু ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তার কথা ভেবে উত্তেজিত দর্শকরা শেষ বলের অন্তিম মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিলেন।

বোলার ট্রেভর চ্যাপেলের কাছে এসে অধিনায়ক এবং বড় ভাই গ্রেগ চ্যাপেল শেষ বারের মতো কিছু নির্দ্দেশ দিলেন। তারপরের অভাবিত ঘটনাটি উপস্থিত দর্শকদের বিস্ময়কেও অতিক্রম করে গেল। ট্রেভ চ্যাপেল ছুটে এলেন এবং আণ্ডার-আর্ম ভঙ্গীতে একেবারে মাটি দিয়ে গড়িয়ে দিলেন বলটি। হতচকিত ব্যাটসম্যান দুরভিসন্ধির ঠাহর পাবার আগেই খেলা শেষ। অস্ট্রেলিয়রা জিতল, কিন্তু ক্রিকেটকে নৃশংসভাবে খুন করলেন গ্রেগ চ্যাপেল।

সত্যি দুঃখ হচ্ছে এই কথা ভেবে যে আমার মতো অনেকেরই প্রিয়তম ক্রিকেটার গ্রেগ চ্যাপেলও শেষ পর্যান্ত এমন একটা কলঙ্কিত অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন? দুঃখ হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে—'মিস্টার গ্রেগ, আপনার ক্রিকেট প্রতিভার প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনি কি বুঝতে পারলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার ডলারের পুরস্কার মূল্যের বিনিময়ে আপনি কি হারালেন? ক্রিকেটের মহান ঐশ্বর্য্য, আদর্শ এবং চিহ্নিত শোভনতার প্রতি কি নিদারুণ অমানবিক আচরণের প্রকাশ ঘটালেন আপনি? মনে পড়ছে কি মিস্টার গ্রেগ, গত ১৯৮০ সালের ৩০শে আগস্ট ক্রিকেটের তীর্থভূমি লর্ডসের সেই কলঙ্কিত অধ্যায়টির কথা? ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বৃষ্টিবিঘ্নিত টেস্ট ম্যাচে আম্পায়ার ডেভিড কনস্ট্যান্ট ও হ্যারল্ড বার্ড যখন পঞ্চমবার পীচ দেখে ফিরছিলেন তখন এম. সি. সি.র কিছু সদস্য আম্পায়ারদের টাই ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করা ছাড়াও অকথ্য গালিগালাজ করেছিলেন। ঘটনার বীভৎসতা আপনাকে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। পরদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আপনার বিস্মিত ঠোঁট ক্রিকেটের সম্ভ্রমরক্ষার্থে কটি কথা উচ্চারণ করেছিল—'ক্রিকেট ঘিরে এমনটি হতে পারে, কল্পনাতীত।

মিস্টার গ্রেগ, প্রশ্ন করতে সত্যি লজ্জা করছে—ক্রিকেট আদর্শের অপমৃত্যু ঘটতে দেখে যে মানুষটি একদিন প্রতিবাদে উচ্চকিত হয়েছিলেন—১৯৮১-র সেই মানুষটিই কি আপনি? গ্রেগ,



আপনার মনে পড়ছে কি প্রথম ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হার মানে খেলা শেষ হবার মাত্র সতেরোটি বল বাকী থাকতে। সেই ম্যাচে অন্তত দু'বার আপনি নিশ্চিত আউট ছিলেন। কিন্তু আম্পায়ারদের সানুগ্রহে এবং একুশ হাজার স্বদেশীয় দর্শকের স্বাভাবিক প্রত্যাশা মিটিয়ে আপনি ৭৪ রানে অপরাজিত থেকে ম্যাচ জিতিয়ে ছিলেন। অথচ খুব দুর্নাম থাকা সত্ত্বেও এর প্রতিবাদে মাঠে কোনো অসদাচরণকে প্রশ্রয় দেন নি ক্লাইভ লয়েড। ঘটনাটি আমাদের মনে আছে।

মিস্টার গ্রেগ, স্মৃতি যদি সত্যিই অবিশ্বাসী না হয় তাহলে আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সেই ওয়ান-ডে ম্যাচটির কথা। দিনের শেষ ওভারের শেষ বলটিতে একটি 'ছয়ের' প্রত্যাশা নিয়ে 'স্ট্রাইকার এন্ডে' আপনি নিজে উপস্থিত দর্শকদের মতোই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। বিশ্বাস করুন, সেই মুহূর্তে বোলার ইয়ান বোথাম আইন অনুযায়ী একটি আণ্ডার আর্ম বল করে ম্যাচটিকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারতেন সহজেই। কিন্তু প্রচণ্ড 'চাপের' মুখে দাঁড়িয়েও বোথাম সেদিন হাসতে হাসতেই শেষ বলটি করেছিলেন একেবারে ঝুলিয়ে। স্পোর্টিং স্পিরিটের উজ্জ্বল নমুনা ছড়িয়ে বোথাম সেদিন ক্রিকেট মাঠ ছেড়েছিলেন।

বর্তমান ঘটনাটি অনেক দূর গড়ানোয় এবং ওপর মহলের প্রচণ্ড চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত আপনি ক্ষমা চেয়েছেন। বলেছেন, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি এমন ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন। মিস্টার গ্রেগ, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যা করেছেন তা কতটা ন্যায়সঙ্গত সে তর্কে যাবার আগে আপনাকে মনে করিয়ে দিই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-ইংল্যাণ্ডের একদিনের সেই ম্যাচটির কথা।

দিনের শেষ বলে সম্ভাব্য পরাজয়কে রোধ করার চেষ্টায় ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক মাইক ব্রিয়ারলি দশজন ফিল্ডসম্যানকেই (বোলারকে দাঁড় করানোর উপায় ছিল না বলে) দাঁড় করেছিলেন বাউণ্ডারী লাইনের উপর। শুনতে আশ্চর্য্য মনে হলেও সেই দশজনের মধ্যে ছিলেন উইকেটরক্ষক ডেভিড বেয়ারস্টো। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এমন ফিল্ড সেটিং ইতিপূর্বে দেখা যায় নি বলে যথেষ্ট সমালোচনাও হয়েছিল। কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল ব্রিয়ারলির 'নেগেটিভ অ্যাপ্রোচের'। কিন্তু আপনার অনুসৃত পন্থায় এবং শুধুমাত্র জেতার চেষ্টায় ক্রিকেটকে খুন করার পরিকল্পনাটি ব্রিয়ারলি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি। চাপের মুখেও ক্রিকেটকে হত্যা করতে তার রুচিতে বেঁধেছিল।

গ্রেগ আপনি ক্ষমা চেয়েছেন। এবং দুরন্ত ক্রিকেট খেলে আপনার কলঙ্ক-কাহিনী হয়তো কিছুটা চাপাও দিতে পেরেছেন। কিন্তু ক্রিকেটানুরাগীদের মনে আছে ১৯৭৫-৭৬ সালে আপনার দাদা ইয়ান চ্যাপেলও অ-ক্রিকেটীয় কলঙ্ক-কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং আবার সেই একই কাজ করে বিতর্কের নায়ক সেজেছিলেন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি অধিকতর নোংরা অন্তত ক্রিকেটীয় অর্থে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া খেলছে এম সি সি-র সঙ্গে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার প্রথম উইকেট পড়ার পর মাঠে এলেন ইয়ান চ্যাপেল। বোথামের প্রথম বলটি খেললেন ব্যাটের মাঝখান দিয়েই। পরের বল বাম্পার। মাথা বাঁচাতে ভীত-সন্ত্রস্ত চ্যাপেল 'ডাক' করলেন। কোনোক্রমে। বল তার গায়ে লেগে ফিল্ডারের নাগাল এড়িয়ে চলে যাচ্ছে দেখে ইয়ান এবং রিক ডালিং 'লেগ-বাই' নিতে ছুটলেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আম্পায়ার হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছেন গ্রাহাম ম্যাকলিওড। তিনি রানটি নাকচ করে দিতেই ক্রুদ্ধ ইয়ান বীভৎস অঙ্গভঙ্গী করে হাতের ব্যাটটি সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এম সি সি-র খেলোয়াড় এবং মুষ্টিমেয় কিছু দর্শককে বিস্ময়ে হতবাক করে মিনিট দুই মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে যাবতীয় আকর্ষণ নিজের দিকে টেনে নিয়ে ইয়ান আম্পায়ারের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন।

আবার বলছি, ঘটনাটি আমরা ভুলিনি। ভুলিনি বলেই ভয় হয় সেই একই রক্ত তো আপনার শরীরেও বইছে। তাই যথেষ্ট ভয়ে ভয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করি — মিস্টার গ্রেগ, আজকের এই নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যেই কি ক্রিকেটীয় মূল্যবোধ এবং শালীনতারক্ষার ভবিষ্যৎ অঙ্গীকারটি উচ্চারিত হল?

আমার মতো অনেকেই যাকে আজও হয়তো সযত্নে প্রিয়তম ক্রিকেটারের আসনে রেখেছেন সেই গ্রেগ চ্যাপেল কি বলেন?

# বথাম কি পারবেন?

দেবাশিস দত্ত

সারা বিশ্বে এখন শুধু একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে — "বথাম কি পারবেন"? লেন হাটন, পিটার মে, কলিন কাউড্রে এবং মাইক ডেনেস যে অনন্য রেকর্ড গড়ে রেখেছেন, এঁদের উত্তরসূরী হয়ে ইয়ান বথাম কি সেই ট্রাডিশন বজায় রাখতে পারবেন? একটু খোলাখুলিই আলোচনা করা যাক। বিশ্ব ক্রিকেটের টেস্ট ম্যাচের ধূসর স্কোরশীটগুলোর দিকে তাকালে, পরিসংখ্যান স্পষ্টতই বলে নিজেদের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে নিজেদের মুঠোয় সিরিজ ধরে রাখতে পারেনি। ভাবলে অবাক হতে হয়, ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট যুদ্ধের ৩৩ বছরের ইতিহাসে চারটি সিরিজের ২০টি টেস্টের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের সংখ্যা তিন। পরাজয়ের সংখ্যা পাঁচ। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝে বাকী ২০টি টেস্ট অমীমাংসীতভাবে শেষ হয়।

তিন মাসের সফরে ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আসার অনেক আগেই থেকেই ক্রিকেট রসিকরা জল্পনাকল্পনা শুরু করে দিয়েছেন। এতদিনেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়করা যা পারেন নি, লয়েড কি সেই কাজ করতে পারবেন?

প্রাক্তন ক্রিকেটার, ক্রিকেট লেখক, বর্তমান দুই অধিনায়ক এবং ক্রিকেটের সাথে জড়িয়ে আছেন এমন কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি, ইংল্যাণ্ড —ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চলতি সফর প্রসঙ্গে কী ভাবছেন, এই অবকাশে তাঁদের মতামত শোনা যাক।

একটি টেস্টে ১৯টি উইকেট লাভের অনন্য নজীরের অধিকারী জিম লেকার বলেছেন "বর্তমানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজই ফেবারিট। আমার একথার প্রধান কারণ হিসেবে বলতে গেলে বলতে হয় একা ভিভিয়ান রিচার্ডসের পারফরমেন্সের ভিত্তিতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতবে। এককথায় 'Viv holds the key' গত ১২ মাসে রিচার্ডসের অসাধারণ সাফল্যের কথা কি কেউ ভুলতে পারবেন? বস্তুত রিচার্ডস একাই গত মরশুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে অনেক সাফল্য এনে দিয়েছেন। শুনছি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পীচ নাকি অপেক্ষাকৃত স্লো হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয় এ সিরিজের ক্রিকেট আকর্ষণীয় পর্যায়ে পৌঁছবে। ইংল্যাণ্ডের বোলিং আক্রমণে অধিনায়ক বথামের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। স্পিন আক্রমণে জন এমবুরী মারাত্মক হয়ে উঠতে পারেন। তবে যে কোনো বোলিং শক্তিকে নির্মূল করে দেবার মত একজন ব্যাটসম্যানও ( ভিভ্ রিচার্ডসের মতো ) যদি ইংলণ্ড দলে থাকতেন, তাহলে ইংলণ্ডের জয়ের সম্ভাবনা বাড়ত।"



ল্যান্স গিবসকে আসন্ন ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট পর্যায়ের ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই গিবস জানালেন, "দুর্ভাগ্য শুরু থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেছনে তাড়া করে এসেছে। অনেক সময় আমরা জিততে জিততে হেরে গেছি। এবারের টেস্ট পর্যায়ের কথা বলতে হলে প্রথমেই বলব এবারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সব দিক থেকে শক্তিশালী। লয়েডের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এখন ব্যালান্সড সাইড। ইংল্যাণ্ডও যথেষ্ট শক্তিশালী। এবারের লড়াই জমবে।"

**ডেনিস কম্পটন :**—"বর্তমান ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সব তারকারা নিজেদের ফর্মের শীর্ষচূড়ায় নেই। শুধুমাত্র পেস বোলাররাই ম্যাচ নির্ধারণ করতে পারবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ক্যারিবিয়ান পীচ অনেক স্লো হয়ে গেছে। এ ধরনের পীচে অফ স্পিনার জিওফ মিলার এবং জন এমবুরীর সাফল্য পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া এরা দুজনেই যদি নিশানায় অবঁথ্য রেখে "স্লোয়ার ফাইটেড ডেলিভারী" করাতে পারে, তাহলে এদের অনেক উইকেট পাওয়ার আশা আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঝড়ের গতির বোলারদের সামনে বয়কট, গুচ, গাওয়ার সফল হবেন—এ আশা রাখি। এক নম্বর উইকেট রক্ষক হিসেবে আমি ডেভিড বেয়ারসটোকে দেখতে চাই। ক্যারিবিয়ান দর্শকরা নিজেদের দেশের জয়কে সবচেয়ে বড় করে দেখেন। তাই ইংল্যাণ্ড ক্রিকেটারদের বলব তারা যেন যে কোনো পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে।"

**ইয়ান বথাম :**— "ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল একটানা বেশ কয়েকমাস প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলে ক্লান্ত। আমার দলের সব খেলোয়াড়রা পুরোপুরি সুস্থ। বোলিং শক্তির কথা বলতে গেলে বলব বব উইলিস, ওল্ড এবং ডিলি নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করবে। ব্যাটিংয়ে বয়কট, গুচ, গাওয়ার, রোজ, প্যাটিং নিজেদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করবেন।"

**ক্লাইভ লয়েড :** "We can beat them back home. অবাক হবার বিষয়-বিগত চারটে সিরিজে আমরা পর পর হারলাম কীভাবে? এবার আমরা জয়ের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

এ মাসের মাঝামাঝি ইংল্যাণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম টেস্ট সিরিজ শুরু হতে চলেছে। অধীর আগ্রহে গোটা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে আছেন। প্রত্যেকেই লক্ষ্য করবেন বথাম উত্তরসূরীদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পারেন কিনা। আবার এও লক্ষ্য করবেন— লয়েড এ সিরিজে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে নতুন নজীর গড়তে পারেন কিনা।

# ফুটবল সুপারস্টার

( এর আগে এই ফিচারে প্রকাশিত হয়েছে ডি স্টিফানো, জোহান ক্রুয়েফ, গারিণচা, লেভ ইয়াসিন, ফ্রানৎজ বেকেনবাউয়ার, ববি মুর এবং কেভিন কীগানের কথা। এবার—ইউসেবিও। জিমি হিলের মূল রচনার ভাবানুবাদ করেছেন অশোক দাশগুপ্ত।)

## ইউসেবিও

### (পর্তুগাল, লোরেন্সো মার্ক স্পোর্টিং ক্লাব, বেনফিকা)

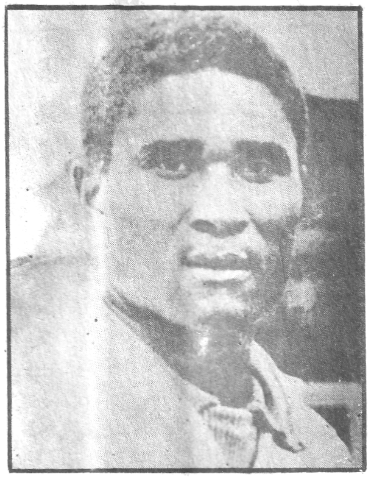
ইউসেবিওকে বলা হয়েছে 'ব্ল্যাক প্যান্থার।' কেউ কেউ বলেছেন —'ইওরোপের পেলে।' বাড়াবাড়ি, কেননা ইউসেবিওকে যখন পাদ-প্রদীপের আলোর বাইরে চলে যেতে হয়, পেলে তখনও ফুটবল দুনিয়াকে রোমাঞ্চিত করে চলেছেন।

তবু এব্যাপারে কারো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে ইউসেবিও এক অসাধারণ ফুট-বলারের নাম, দু' পায়ে এমন নিখুঁত শুটিং ফুটবলের ইতিহাসে কদাচিৎ দেখা গেছে। ইউসেবিও মানেই গোল, নাটকীয় সব গোল। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এই যে গোল করার প্রচণ্ড দক্ষতায় মুগ্ধ দর্শকেরা মোজাম্বিকের এই ছেলেটির মাঝমাঠের পরিশ্রম এবং শিল্পকর্মের তারিফ কখনোই করেননি।

একথা কোনমতেই সত্যি নয় যে ইউসেবিও শুধুমাত্র গোলগেটার ছিলেন। সাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বলতে গেলে তিনি বেন-ফিকাকে ইওরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাবে এবং পর্তুগালকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলে পরিণত করেছিলেন।

ফুটবল দুনিয়াকে ইউসেবিও সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেন উনিশশো ছেষট্টি সালের বিশ্ব কাপে। প্রায় একাই পর্তুগালকে সেমিফাইনালে নিয়ে যান নাটকীয়ভাবে। তিনি উনিশশো পয়ষট্টির ইওরোপের বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবলার, বেন-ফিকার হয়ে ইওরোপিয়ান কাপ মেডেল পেয়েছেন একবার, তাঁর সময়ে বেনফিকা ইওরোপিয়ান কাপ ফাইনালে উঠেছে আরো তিনবার।

ইউসেবিও সম্পর্কে প্রথম কথা, তিনি ছিলেন নিখুঁত 'অ্যাথলীট।' খুব লম্বা ছিলেননা, কিন্তু অত্যধিক চওড়া কাঁধ এবং পুষ্ট উরুযুগল



তাঁকে দিয়েছিল আশ্চর্য শক্তি এবং সক্ষমতা। এর সঙ্গে গতির ব্যাপারটা যোগ করুন। টপ ফর্মে তাঁকে বিপক্ষ ডিফেন্ডাররা ধরা তো দূরের কথা, ঠিকঠাক দেখতেই পাননি। এই তিনি আসছেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নেই। ট্যাকল করার আগেই বল নিয়ে তিনি চলে গেছেন।

আর তাঁর শুটিং! কামানের গোলার মতো শট, বাঁক ধরানো শট, দূরতম কোণ থেকে শট — সবই তাঁর ছিল। পেনাল্টি শটও নিতেন দারুণ। অবশ্য, কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন যে হাতাহাতি খেলায় তিনি কিছুটা গুটিয়ে যেতেন।

একথা সত্যি যে প্রচণ্ড মার খেয়েও খেলার মধ্যে দারুণভাবে ফিরে আসার ক্ষমতা ইউ-সেবিওর ছিল না, যে ক্ষমতা জর্জ বেস্টকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিল। ইউসেবিওর বক্তব্য ছিল এই যে দর্শকরা তাঁর খেলা দেখতে চান, সুতরাং তাঁকে মারধোর করে দর্শকদের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নবি স্টাইলস এবং আরো কয়েকজন কড়া ডিফেন্ডার অবশ্য ইউসেবিওর উপরোক্ত বক্তব্য মেনে নেননি এবং যথোচিত ব্যবস্থা নিয়েছেন। তবে নবি স্টাইলস কখনোই ইওরোপের অন্য দু'চারজন ডিফেন্ডারের মতো নৃশংস ট্যাকলিং করেননি।

ইংরেজ দর্শকেরা বেশ কয়েকবার ইউসেবিওর খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এবং উনিশ-শো ছেষট্টি সালে ইংল্যাণ্ডের মাটিতেই ইউসেবিও জীবনের সেরা ম্যাচ খেলেছেন।

বিশ্বকাপ কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তর কোরিয়া বিরতির আগেই ৩—০ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। আগের ম্যাচে ইতালিকে হারিয়েছিল কোরিয়ার টীম। উত্তর কোরিয়া তিন গোলে এগিয়ে যাওয়ার পরই দর্শকেরা পর্তুগালকে স্বভাবতই বিদায় জানাতে প্রস্তুত হলেন। মাঠের মধ্যে একজন অন্য কিছু ভাবছিলেন। এক, দুই, তিন, চার — পর পর চারটি গোল করল পর্তুগাল। চারটিই ইউসেবিওর।

বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা (৯) হিসেবে এক হাজার পাউণ্ডের বিশেষ পুরস্কারও তিনি পেলেন।

পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার রাজধানীর এক অতি দরিদ্র পরিবারের ছেলেটি সত্যিই অনেক, অনেক ওপরে উঠে এসেছিল।

উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর জন্ম। আট ভাইবোনের সংসারে কঠোর দারিদ্রের ছায়া ফেলে তাঁর বাবা যখন মারা যান, ইউসেবিওর বয়স তখন মাত্র পাঁচ। স্কুলে বাস্কেটবলার হিসেবে নাম করে ফেলেন শুধুমাত্র গতিবেগের জন্য। লোরেন্স মার্ক স্পোর্টিং ক্লাবে যোগ দিয়ে মাত্র সতেরো বছরেই পেশা-দার হন ইউসেবিও। এবং প্রথম ম্যাচেই বিখ্যাত জুভেন্টাস টীমের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন।

পর্তুগালের মূল ভূখণ্ড থেকে ডাক আসতে দেরি হয়নি। বেনফিকা তাঁকে পেতে চাইল, চাইল লিসবনের স্পোর্টিং ক্লাবও। কয়েকমাস টানাপোড়েনের পর বেনফিকাই রত্নটি হাতে পেল।

এক্ষেত্রেও ইউসেবিওর আবির্ভাব কিছু কম চাঞ্চল্যকর নয়। মাত্র পঁচিশটি ম্যাচ খেলেই তিনি পর্তুগালের জাতীয় দলে ঢুকে যান এবং উনিশশো একষট্টিতে ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জীবনের দ্বিতীয় আন্ত-র্জাতিক ম্যাচে দু'বার ক্রসপিস কাঁপিয়ে ফুটবল দুনিয়াকে জানিয়ে দিয়েছিলেন 'আমি এসে গেছি।'

ইউসেবিও প্রবলভাবেই এসে গিয়েছিলেন। পেলের সান্টোসের বিরুদ্ধে বেনফিকার হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন। ডি স্টিফানো-পুসকাস-সান্টামারিয়া-জেন্টোর রিয়েল মাদ্রিদ ইওরো-পীয়ান কাপ ফাইনালে ৫—৩ গোলে বেনফিকার কাছে হেরেছে মূলত তাঁরই নৈপুণ্যে। আট-ষট্টির ইওরোপীয়ান কাপ ফাইনালে বেনফিকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে হেরে গেলেও, ইউসেবিওর খেলা ওয়েম্বলীর দর্শকদের যথা-রীতি মুগ্ধ করেছে।

নিজের বাণিজ্যিক মূল্য সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকলেও, তাঁর শত্রুর সংখ্যা ছিল নগণ্য।

পরের দিকে তিনি ক্ষুরধার আক্রমণ ক্ষমতার চেয়ে পরিশ্রমী ফুটবলের দিকেই মনোযোগ দেন। বেনফিকা থেকে তাঁকে কিছুদিন পরেই বিদায় নিতে হয়। নতুন তারকারাতো উঠে আসেই। কিন্তু ইউসেবিও ফুটবল ছাড়তে পারেননি। উনিশশো আটাত্তর সালেও তাঁকে খেলতে দেখা গেছে — পর্তুগালের দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে।

# সৈয়দ মোদী কি অসাধারণ খেলে প্রকাশকে হারালেন?

শিবাজী দাশগুপ্ত



সৈয়দ মোদী

প্রকাশ পাড়ুকোনের প্রভাব ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের আঙিনায় এত বিরাট আকার ধারণ করেছিল যে অন্যান্য উদীয়মান খেলোয়াড়দের আমরা ঠিক ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চাইতাম না। ইতিমধ্যে সৈয়দ মোদী, উদয় পাওয়ার বা পার্থ গাঙ্গুলিরা যে অনেকখানি এগিয়েছেন সে খেয়ালও অনেকের ছিলনা। বেজোয়াদায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ব্যাডমিন্টনের আসরে প্রকাশকে হারিয়ে মোদী খেতাবটি হাতিয়ে নিতেই খানিকটা চেতনার উদয় হল। মোদী কি সত্যি প্রভূত উন্নতি করে ফেললেন? অনেকে তা ভাবতেই পারেন, কারণ প্রকাশের ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশীপে অসাধারণ সাফল্যের কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যান নি।

আমরা অনেকেই তখন বেজোয়াদায় ছিলাম না। সুতরাং সৈয়দ মোদীর প্রকৃত ক্রীড়াদক্ষতা বিচার করবার সুযোগ আমাদের ছিল না। যাঁরা খেলোয়াড় কিংবা প্রশিক্ষক হিসাবে সেখানে হাজির ছিলেন তাঁদেরই মতামতের উপর নির্ভর করতে হল। আলোচনা হচ্ছিল কলকাতা ময়দানের সন্ধ্যাকালীন একটি আড্ডায় একজন বললেন, "মোদীর সমসাময়িক খেলোয়াড়দের মতে মোদীর সাফল্য নেহাৎ সৌভাগ্যের ফল। মোদী জিতেছেন বেশীর ভাগ নেগেটিভ পয়েন্টে।" এই বক্তব্য শেষ না হতেই কাছাকাছি বসা একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং এককালের নামজাদা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় আপত্তি জানালেন। তাঁর মতে প্রকাশের মতন বড় খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এমনভাবে নেগেটিভ পয়েন্ট পাওয়াকে ঠিক ভাগ্যের ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্যই ভাল খেলেছেন সৈয়দ মোদী

তবে মোদীর সাফল্যের চাইতে প্রকাশের ব্যর্থতাই যে আকারে বড় ছিল সে বিষয়ে খানিকটা নিঃসন্দেহ হওয়া গেল বেজোয়াদায় উপস্থিত একজন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান এবং বর্তমানে একজন বিশেষজ্ঞের বক্তব্য শুনে। তাঁর ধারাবাহিক ব্যর্থতা প্রকাশকে প্রচণ্ড টেনশানের মুখে ফেলে দিয়েছিল। সাধারণতঃ প্রকাশ বনাম মোদীর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় মোদী ৫এ বা ৬এ গেম খেয়েছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। এবারের ফাইনালে প্রথম গেমে ঐ গণ্ডী মোদী পেরোতেই প্রকাশ মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চল হয়ে পড়েন। তার ফলেই তার ধারণাতীত ভুলচুক করবার সুযোগ নিয়েছেন সৈয়দ মোদী। শুরু থেকেই যে টেনশান নিয়ে প্রকাশ খেলছিলেন, প্রথম গেমে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। দ্বিতীয় গেমে এক সময় স্কোর ছিল ১৩—২, সৈয়দ মোদীর অনুকূলে। সুতরাং প্রকাশের ব্যর্থতা মোদীর মনোবল বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত জাতীয় চ্যাম্পিয়নের খেতাব এনে দিয়েছে।

সোজা কথা, সৈয়দ মোদী এমন কিছু ভাল খেলেন নি। প্রকাশ পাড়ুকোনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন মাত্র। কিন্তু আমার মনে হয় না একজন জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে এমন ছোট করে দেখার কোন অবকাশ আছে। বলব না আমি সৈয়দ মোদীকে বহুবার দেখেছি, তবে ১৯৭৯ সালে নেতাজী স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টনের আসরে ছেলেটির খেলা অবশ্যই অনেকের নজর কেড়েছিল বর্তমান বয়স ২১-২২ মতন হবে। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে ব্যাডমিন্টনের আসরে ভারতের অন্যতম ভরসা। কেবলমাত্র স্টাইলিশ হলেই নয়। ছেলেটির অন্য গুণও আছে।

উত্তরপ্রদেশের এই উদীয়মান তরুণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একজন প্রাক্তন বেঙ্গল নাম্বার ওয়ানকে। তাঁর আক্রমণাত্মক মেজাজের খেলার জন্য আজও তিনি সুপরিচিত। রেলের চাকরীর সূত্রে আজ তিনিও সৈয়দ মোদীর কর্মস্থল গোরাখপুরের কাছাকাছি উত্তরপ্রদেশের প্রবাসী। এই খেলোয়াড়টির জবাব ছিল ছোট, কিন্তু তার মধ্যেই মোদীর একাগ্রতার নমুনা পাওয়া গেল। তিনি বললেন, "মোদীর বড় গুণ সে সহজে নেগেটিভ পয়েন্ট দেয় না।" প্রশ্ন করলাম, "তবে কি ধরে নেব, মোদী দীনেশ খান্নার মতন রক্ষণাত্মক খেলোয়াড়?" উত্তরে ঐ প্রাক্তন খেলোয়াড় জানালেন, "মোদীর হাতে যথেষ্ট স্ট্রোক আছে কিন্তু খুব নিশ্চিত না হলে মারেনা।" মোদীর এই ইচ্ছাশক্তির এই স্পৃহার নিশ্চয়ই দাম আছে। তবে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এইটুকুই বলব, যদি সৈয়দ মোদী এই ধারাটিকে ধরে রাখতে চান, তবে আন্তর্জাতিক আসরে ভাল ফল করতে গেলে মোদীকে শারীরিক সক্ষমতা বাড়াতেই হবে। দমে ঘাটতি থাকলে চলবে না। স্মরণ করুন প্রকাশের ১৯৭৯ সালে নেতাজী স্টেডিয়ামে পরাজয়ের কথা। তৃতীয় গেমে নেটে এগিয়ে আসা সারতিকাকে ফাঁকিতে ফেলতে প্রকাশ বেস লাইনে লব করেছিলেন বারবার, কিন্তু তাঁর ইন্দোনেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মিড কোর্টে ঐ লবগুলিকে ধরে নিয়ে স্ম্যাশ করেছেন। প্রকাশ বিস্ময় হতবাক হয়ে সেদিন পরাজয় স্বীকার করেন। বিপক্ষকে খেলিয়ে জেতবার অভিপ্রায় থাকলে সৈয়দ মোদী নিশ্চয়ই বিপক্ষের শারীরিক সক্ষমতা ও ক্ষিপ্রতার কথা মনে রাখবেন।

সৈয়দ মোদী নিশ্চয়ই হঠাৎ উড়ে এসে জাতীয় খেতাবটি হাতিয়ে নিয়ে যাননি। গত চার পাঁচ বছর ধরেই সৈয়দ মোদী জাতীয় আসরে নজর কাড়ছিলেন। কিন্তু প্রকাশের মত প্রতিভাকে টপকে যাবার আত্মবিশ্বাস কারো মনে আনতে পারেন নি। তবে শুরু আরও কিছু আগেই। সবে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছেন দুই তরুণ। এক ইউ. পি.র সৈয়দ মোদী এবং অপরজন মহারাষ্ট্রের উদয় পাওয়ার। জাতীয় জুনিয়র ব্যাডমিন্টনের আসরে প্রথমবছর বেশী প্রশংসা, বেশী জনপ্রিয়তা আদায় করেন উদয় পাওয়ারই। কারণ তিনি ন্যাচারাল স্ট্রোকমেকার। কিন্তু শারীরিক অপটুতা উদয়কে সৈয়দের পিছনে ফেলে দেয়। আমরা আশা করব এই সাফল্য সৈয়দ মোদীকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার পাথেয় যোগাবে। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন হয়ত একদিন তাঁর থেকে বড় কিছু পাবে।



প্রকাশ পাড়ুকোন

# কথাবার্তা

( ন্যাটা ব্যাটসম্যানেরা চিরকালই দর্শকদের মুগ্ধ রেখেছেন। এবং সেই ব্যাটসম্যানের নাম যদি হয় নীল হার্ভে — মুগ্ধতার আবেশ থেকে যেতেই পারে সারাজীবন। নীল হার্ভে কলকাতায় এসেছিলেন সি এ বি-র সুবর্ণজয়ন্তী ক্রিকেট উৎসবে। গত ৪ জানুয়ারী হোটেল হিন্দুস্থানে হার্ভের সঙ্গে খেলার কাগজের পক্ষে কথা বলছেন অলক চট্টোপাধ্যায়। )

**খেলার কাগজ :** খেলার কাগজ ও কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমিকদের পক্ষ থেকে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। শেষবার যখন ইডেনে খেলেছিলেন তারপর অনেকদিন চলে গেছে— প্রায় নতুন করে ইডেন দেখলেন। আজকের ইডেন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ?

**নীল হার্ভে :** অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ, কলকাতায় আবার আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছি। ইডেনকে প্রায় নূতন করে চিনতে হল। অনেক বড় স্টেডিয়াম হয়েছে, মাঠের চারদিকের সেই পরিবেশও নেই, নূতন চমৎকার ক্লাব হাউস তৈরী হয়েছে।

**খেলার কাগজ :** মাঠের আউটফিল্ড এবং পীচ সম্পর্কে আপনার মত কি ?

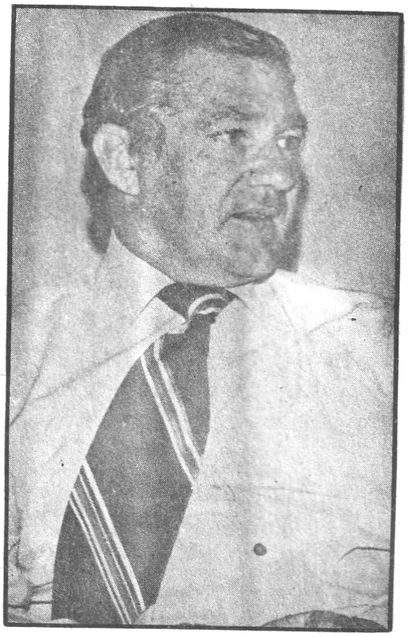
**নীল হার্ভে :** আউটফিল্ড আগে আরো সবুজ ছিল, পীচও সম্ভবত একটু স্লো হয়ে গেছে।

**খেলার কাগজ :** বর্তমানে যে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া সফর করছে তাদের সম্পর্কে আপনার মত কি ? আপনি কি তাদের কোনো খেলা দেখেছেন ?

**নীল হার্ভে :** প্রথম টেস্টে প্রথম দিনের মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত দেখেছি, এছাড়া তাদের অন্য কোন ম্যাচ দেখিনি সুতরাং সর্বাঙ্গীন মন্তব্য করা মুশকিল তবে ১ম টেস্টের শুরু দেখে মনে হয়েছে লিলির নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার পেস বোলাররা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের খুব মুশকিলে ফেলবে।

**খেলার কাগজ :** ১৯৪৮ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে টেস্ট খেলতে নেমেই আপনার অসাধারণ ব্যাটিং এবং সেঞ্চুরী চিরকালের আলোচনার বস্তু এবং ঐ সফরে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে খেলার সৌভাগ্য আপনার হয়েছিল। আপনার প্রথম ইংল্যাণ্ড সফর, ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্ব এবং প্রথম সেঞ্চুরী সম্পর্কে সংক্ষেপে যদি কিছু বলেন।

**নীল হার্ভে :** মাত্র ১৯ বছর বয়সে প্রথম টেস্ট খেলেছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ পর্যায়ের ক্রিকেট খেলার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না সেজন্য ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে প্রথম দিকে



কয়েকটি কাউন্টি ম্যাচে ভাল ব্যাট করতে পারছিলাম না এবং সেজন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমার রুম মেট ছিলেন স্যাম লকস্টন তাঁকে আমার দুশ্চিন্তার কথা বলার পর তিনি আমাকে আমাদের অধিনায়ক ডনের কাছে নিয়ে গেলেন। ডন আমাকে আশ্বস্ত করে ছোট্ট এক লাইনের উপদেশ দিলেন যা আমি মনে করি যে কোন তরুণ ক্রিকেটারের কাছে অমূল্য উপদেশ। উনি বললেন—'Keep the ball down on the ground, you won't be out in England if you can do that'. বলাই বাহুল্য ডনের উপদেশ আমার আত্মবিশ্বাস অনেক অসাধারণ বাড়িয়ে দিয়েছিল মধ্যমণি ডন ছাড়া আরো অনেক অসাধারণ খেলোয়াড় ঐ সফরে ছিলেন এবং তাঁদের সান্নিধ্য আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল। সেঞ্চুরী প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলবো বড় রানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে কিছুটা অস্বস্তি ছিল কিন্তু তখন উইকেটে ছিলেন কিথ মিলার। আমি যাওয়ার পর তিনি সহজাত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে কয়েকটি বাউণ্ডারী করলেন এবং একবার প্রচণ্ড ছক্কা মেরে বলটিকে দর্শকদের মধ্যে ফেলে দিলেন, স্বাভাবিক ভাবে আমার উপর থেকে মানসিক চাপ অনেক কমে গিয়েছিল। নবাগত একজন খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করার পক্ষে এর চেয়ে ভালো পন্থা আর কিছু হতে পারে না অভিজ্ঞ মিলার সেটা জানতেন। অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য অধৈর্য হয়ে আউট হয়েছিলাম—এখনো মনে আছে ১০০ থেকে ১১২তে পৌঁছেছিলাম তিনটি বাউণ্ডারী করে। সব মিলিয়ে প্রথম ইংলণ্ড সফর আমার কাছে সব দিক থেকে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

**খেলার কাগজ :** আপনি দীর্ঘদিন অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন এবং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু অসাধারণ খেলোয়াড়দের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। শ্রেষ্ঠ দুজন অলরাউণ্ডার হিসাবে কোন নাম দুটি বেছে নেবেন ?

**নীল হার্ভে :** গ্যারী সোবার্স ও কিথ মিলার।

**খেলার কাগজ** এদের দুজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন উঠলে আপনার উত্তর কি হবে— যদি ব্যাখ্যা করেন।

**নীল হার্ভে :** দুজনেই অসাধারণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে দুজনেই অতুলনীয়। তবে ব্যাটিংয়ের সূক্ষ্ম বিচারে সোবার্স অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং অপেক্ষাকৃত নিপুণ বলে আমার মনে হয়। পেস বোলিংয়ে মিলার অধিকতর নিপুণ এবং ফিল্ডিংয়ে দুজনেই উচ্চতম পর্যায়ের। তবে স্পিন বোলিং ইত্যাদি প্রশ্ন বিচার করে আমি সোবার্সকেই শ্রেষ্ঠতর বলবো। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা উচিৎ দুজনের ক্রিকেট-দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য ছিল, এই দুজন বিরল ক্রিকেট প্রতিভা একইসঙ্গে তাঁদের সেরা দিনগুলি অতিবাহিত করলে বিভিন্ন দেশের দর্শকরা অজস্র অসাধারণ ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে পেত এতে কোন সন্দেহ নেই।

**খেলার কাগজ :** টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইংল্যাণ্ড বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আসছে। টেস্ট ম্যাচের শুরু থেকে সেরা ইংলিস ব্যাটসম্যান হিসাবে কাদেরকে চিহ্নিত করবেন ?

**নীল হার্ভে :** লেন হাটন, ডেনিস কম্পটন এবং পিটার মে।

**খেলার কাগজ :** ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

**নীল হার্ভে :** সোবার্স, কানহাই ও বর্তমানের রিচার্ডস ছাড়া থ্রি ডব্লিউ এর ব্যাটিং আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯৫২ সালে ন্যাচারাল কণ্ডিশনে এবং চিটিকি উইকেটে থ্রি ডব্লিউয়ের খেলার স্মৃতি আমার মনে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

**খেলার কাগজ :** ক্রিকেট এখন পেস বোলিংয়ের একচ্ছত্র শাসন চলেছে এবং ব্যাটসম্যানের প্রতি ফাস্ট বোলারদের আক্রমণ কিছুটা বিপদজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেজন্য ব্যাটসম্যানরা মাথা বাঁচানোর উপায় হিসাবে হেলমেট ব্যবহার করছেন—এই পেস বোলিং ও হেলমেট প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য জানতে চাইছি।

**নীল হার্ভে :** ফাস্ট বোলাররা সব সময়ই চান ব্যাটসম্যানরা যেন শঙ্কিত থাকেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাউন্সারের প্রয়োগ একান্ত স্বাভাবিক। ব্যাটসম্যানদের পক্ষ থেকে ব্যাপারটা

বিচার করলে আমি বলবো এখনকার অধিকাংশ ব্যাটসম্যানদের ফুটওয়ার্ক ত্রুটিপূর্ণ। দ্রুত গতি সম্পন্ন বোলারদের মোকাবিলা করার জন্য, ভাল দৃষ্টিশক্তি, চমৎকার রিফ্লেক্স এবং সঠিক ফুট-ওয়ার্ক দরকার। সাধারণ ব্যাটসম্যানরা যারা এসব যোগ্যতায় পিছিয়ে থাকবেন তাদের পক্ষে হেলমেট একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিকেট সরঞ্জাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

**খেলার কাগজ :** ব্র্যাডম্যানের পরে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের মধ্যে হুকশটে আপনার পারদর্শিতা বিশ্ববন্দিত ছিল—আপনি কি মনে করেন হেলমেট ব্যবহার হুকশটে সাবলীলতা ক্ষুন্ন করছে?

**নীল হার্ভে :** আমি নিজে কখনো হেলমেট ব্যবহার করিনি। আমাদের সময়কার ক্রিকেটে হেলমেট ছিলনা বলা যায়, সুতরাং হেলমেট পরে ব্যাট করায় কোন অসাচ্ছন্দ আছে কিনা আমার পক্ষে বলা মুশকিল। তবে এমন হতে পারে হেলমেট পরে ব্যাটসম্যানের মনে হতে পারে তার মারাত্মক আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম সুতরাং বলের লাইনের ইন সাইডে এসেই হুক করার প্রবনতা বাড়তে পারে—সেক্ষেত্রে ক্যাচ আউট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ঠিকমত হুক করতে গেলে বলের উপর নজর রেখে বলের লাইনের বাইরে এসে রিস্টকে রোল করে নামিয়ে দিতে হবে যাতে বল দ্রুত মাটির দিকে নেমে যায়। হেলমেট পরে কোন কোন ক্ষেত্রে আঘাত না লাগার সম্ভাবনাজাত আত্মবিশ্বাস কিছুটা অসুবিধা ঘটাতে পারে।

**খেলার কাগজ :** আপনার প্রিয় শট কি?

**নীল হার্ভে :** কভার ড্রাইভ।

খেলার কাগজ : অপসৃয়মান স্পিন বোলিং কি ক্রিকেটের আকর্ষণ কিছুটা বিলুপ্ত করছে বলে আপনার মনে হয় না?

**নীল হার্ভে :** নিশ্চই. উঁচু জাতের স্পিন বোলিং খেলতে ব্যাটসম্যানের টেকনিক, ফুট-ওয়ার্ক ও ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমি মনে করি পেস বোলিংয়ের সঙ্গে ভালো স্পিন বোলারকেও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। পেস এর বাড়াবাড়ির জন্য ঘন্টায় অত্যন্ত কম সংখ্যক ওভার খেলা হচ্ছে সেটাতো এক অংশ দর্শকদের অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা। ওভার রেট কম পক্ষে ঘন্টায় ১৬ ওভার করা উচিৎ।

**খেলার কাগজ :** আপনার সময়কার সেরা স্পিনার হিসাবে কাদের নাম বলবেন?

**নীল হার্ভে :** ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অবশ্যই লেকার এবং লক। দক্ষিণ আফ্রিকার টেফিল্ড এবং ভারতের সুভাষ গুপ্তেও অসাধারণ স্পিন বোলার ছিলেন। আমার টেস্ট জীবনের শেষ দু তিন বছরে দেখা সেরা স্পিনার গিবস।

**খেলার কাগজ :** বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে কাকে নির্বাচিত করবেন?

**নীল হার্ভে :** সুনীল গাভাসকার—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে সে নিজে প্রমাণিত করেছে।

**খেলার কাগজ :** অন্য কোন ভারতীয় ব্যাটসম্যান আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কি?

**নীল হার্ভে :** বিশ্বনাথ, ভেঙ্গসরকার এরাও চমৎকার ব্যাটসম্যান।

**খেলার কাগজ :** যে নিউজিল্যাণ্ড দল বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া সফর করছে তাদের কোন খেলোয়াড় প্রসঙ্গে আপনার কোন বিশেষ অভিমত আছে কি?

**নীল হার্ভে :** রিচার্ড হ্যাডলী আমাকে মুগ্ধ করেছে—যথার্থই অসাধারণ বোলার।

**খেলার কাগজ :** আপনার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সেরা চারজন পেস বোলার হিসেবে কাদেরকে নির্বাচন করবেন এবং এদের মধ্যে সেরা কাকে বলবেন?

**নীল হার্ভে :** লিণ্ডওয়াল, মিলার, ডেভিড-সন এবং অবশ্যই ডেনিস লিলি। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেব লিণ্ডওয়ালকে। আমার ধারণা ফাস্ট বোলিংয়ের এক সেরা আদর্শ হিসাবে লিণ্ড ওয়াল চিরকাল চিহ্নিত হবেন। বর্তমান কালের মধ্যে ডেনিস লিলিকে অনায়াসে সেরা হিসাবে ধরতে পারেন।

**খেলার কাগজ :** আপনার ক্রিকেট জীবনের শুরু কিভাবে হয়েছিল—সংক্ষেপে যদি আমাদের বলেন।

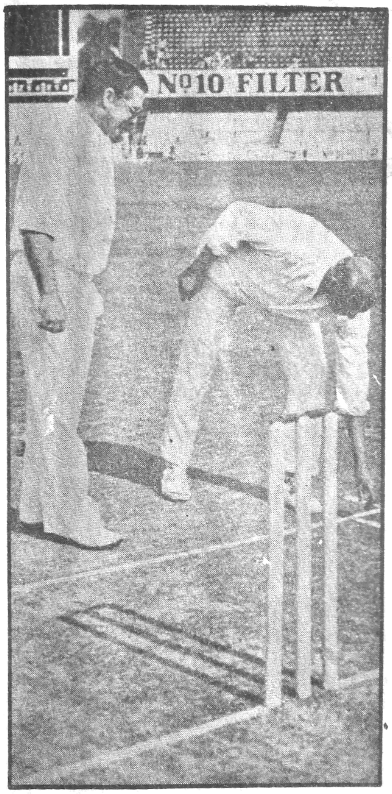
**নীল হার্ভে :** ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল। মেলবোর্ণে যে ক্লাবে আমার ক্রিকেট জীবন শুরু করি তার নাম FITZRAY। মেলবোর্ণে যে বিভিন্ন গ্রেড ক্রিকেট চালু আছে তার ফিফ্‌থ গ্রেডে প্রথম খেলতে শুরু করি যখন আমার বয়স ছিল ১৩। ১৪ বছর বয়সেই আমি সেকেণ্ড গ্রেডে খেলতে শুরু করি এবং ১৫ বছর বয়সে ফাস্ট গ্রেডে খেলার যোগ্যতা অর্জন করি কারণ ফিফ থ গ্রেড থেকে ফাস্ট গ্রেডে আসার মধ্যে কয়েকটি সেঞ্চুরী সহ বেশ কিছু বড় রান সংগ্রহ করতে পেরে-ছিলাম।

**খেলার কাগজ :** ছোটবেলায় ক্রিকেটের শিক্ষা আপনি কার কাছে পেয়েছেন?

**নীল হার্ভে :** যাঁরা বিখ্যাত কেউ নন, যে দুজন আমাকে যত্ন করে ক্রিকেটের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে Aurther Liddicate এবং Joe Plant। এরা দুজনেই বিশ্বযুদ্ধের আগে ভিক্টোরিয়ার হয়ে শেফিল্ড শীল্ডের ম্যাচ খেলেছিলেন।

**খেলার কাগজ** আপনি তো দীর্ঘদিন (১৯৬৭-৭৮) অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাচক ছিলেন—বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনাময় তরুন খেলোয়াড় হিসাবে কাদের চিহ্নিত করবেন?

**নীল হার্ভে :** লসন যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বোলার। পিটার স্লিপ ও যথেষ্ট উন্নতি করেছে ডেভিড বুনোই তাসমানিয়া থেকে হয়তো প্রথম




হার্ভে ও [illegible]

খেলোয়াড় যে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলবে। উঁচু দরের স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা তার আছে। চ্যাপেল ভাইদের কনিষ্ঠ ট্রেভর চ্যাপেলও ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে নিয়মিতভাবে খেলতে পারে। ট্রেভরের বাড়তি সুবিধা হচ্ছে মোটামুটি বল করতে পারার ক্ষমতা। এছাড়া ট্রেভর চমৎকার ফিল্ডসম্যান তবে ইয়ান চ্যাপেল বা গ্রেগ চ্যাপেলের মত স্ট্রোক প্লেয়ার ট্রেভর নয় ওকে গ্রাফটার বলতে পারেন।

**খেলার কাগজ :** ডেভিড হুকস, মার্টিন কেন্ট—এদের প্রসঙ্গে কিছু বলবেন?

**নীল হার্ভে :** ডেভিড হুকস আবার ফিরে আসার চেষ্টা করছে, মার্টিন কেন্টও তাই, তবে আমার মনে হয় মার্টিন কেন্ট একটু ওভার রেটেড।

**খেলার কাগজ :** একটা প্রশ্ন আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে সেটা হচ্ছে ডাগ ওয়াল্টার্সের মত প্রতিভাবান খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ডে কখনোই তাঁর উপযুক্ত খেলা খেলতে পারেননি কেন? এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

**নীল হার্ভে :** আমার ধারণা ওয়াল্টার্সের টেকনিক মুভিং বলের বিরুদ্ধে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। সেইজন্যই হয়তো সে ইংল্যাণ্ডে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেনি।



**খেলার কাগজ** মিঃ প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ পৃথিবীর ক্রিকেট যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং অনেকেই স্বীকার করেন পৃথিবীর ক্রিকেটারদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য এর প্রয়োজন ছিল—আপনার অভিমত কি ?

**নীল হার্ভে** এই মতের সঙ্গে আমি এক মত। প্যাকার এ্যাফেয়ারের পর, ক্রিকেটাররা অবশ্যই বেশী টাকা পাচ্ছেন এবং এর প্রয়োজনও ছিল। এখন একজন অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলোয়াড় বছরে ৩০ হাজার ডলারের বেশী উপার্জন করে। কয়েক বছর আগে যেটা কল্পনা মনে হত।

**খেলার কাগজ** আর্থিক লাভের দিক থেকে এক দিনের ক্রিকেট ম্যাচ একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকে—সীমিত ওভারের এই ক্রিকেট প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি ?

**নীল হার্ভে** ক্রিকেটের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমার মত সীমিত ওভারের ক্রিকেটার বিরুদ্ধেই যাবে তবে জনপ্রিয়তা এবং আর্থিক গুরুত্বের কথা ভাবলে এই ধরণের খেলাকে মেনে নিতেই হবে।

**খেলার কাগজ** অসাধারণ ফিল্ডার হিসাবে আপনার তুলনা ছিলনা, ইডেনে আমরা তার নিদর্শনও দেখেছি। আপনার প্রিয় কভার অঞ্চলে ফিল্ডিং করার ক্ষেত্রে কোন অস্ট্রেলিয়ান ফিল্ডারকে আপনার পছন্দ ?

**নীল হার্ভে** পল শিহান।

**খেলার কাগজ** ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য আপনার কোন পরামর্শ আছে ?

**নীল হার্ভে** প্রকৃত ফাস্ট বোলার ছাড়া পৃথিবীর শক্তিশালী দেশের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। কপিলদেবের বোলিং আমি দেখিনি তবে শুনেছি খুবই ভাল বোলার। ভারতের উচিৎ ফাস্ট উইকেট তৈরীর দিকে মন দেওয়া যাতে অবিলম্বে কপিলদেবের সঙ্গী হিসাবে তরুণ বোলার তৈরী হতে পারে। ভালো উইকেট না হলে স্ট্রোক প্লেয়ার তৈরী হবে কি করে ? সুতরাং সামগ্রিকভাবে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য আগে উইকেটের উন্নতি ঘটাতে হবে।

**খেলার কাগজ** আপনার দেখা সেরা উইকেটকীপার কে ?

**নীল হার্ভে** ডন ট্যালন, অসাধারণ কীপিং করা ছাড়া সর্বদা দলের প্রয়োজনে বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যেত।

**খেলার কাগজ** আপনি সাধারণত তিন নম্বরে ব্যাট করতেন সুতরাং ফাস্ট বোলার বা মিডিয়াম পেসারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হয়েছে—এই পেস বোলারদের মধ্যে কার সম্পর্কে আপনার শ্রদ্ধা সবচেয়ে বেশী ?

**নীল হার্ভে** অ্যালেক বেডসার।

**খেলার কাগজ** আমাদের দেশে একটা জনপ্রিয় তর্ক আছে বেদী ও মানকাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। আপনি দুজনকেই দেখেছেন, বাঁহাতি স্পিনার হিসাবে কাকে আপনার শ্রেষ্ঠতর মনে হয় ?

**নীল হার্ভে** বিষেন বেদী।

**খেলার কাগজ** দীর্ঘদিন নির্বাচক হিসাবে কাজ করেছেন। এই মুহূর্তের একটা বিশ্ব একাদশ তৈরী করবেন ?

**নীল হার্ভে** কঠিন প্রশ্ন, তবুও—গাভাসকার, বয়কট, রিচার্ডস, গ্রেগ চ্যাপেল, মিয়াদাদ রিচার্ড হ্যাডলী, মার্শ, গারনার, লিলি, ক্রফ্ট ও দোশী।

**খেলার কাগজ** শেষ প্রশ্নটি হয়তো আপনাকে দুঃখিত করবে কিন্তু উপায় নেই তার কারণ এই প্রশ্ন আমাদেরকেও দুঃখিত করেছে দীর্ঘ দিন। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব থেকে আপনি বঞ্চিত হলেন কেন ?

**নীল হার্ভে** আমি দুঃখিত। এ প্রশ্নের উত্তর আমি সত্যিই জানি না। ১৯৬৭ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে অধিনায়ক ছিলেন আয়ান জনসন যিনি আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি রিপোর্টে কি লিখেছিলেন জানি না—হয়তো আয়ান ক্রেগের স্বপক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন। অথচ ক্রেগ অধিনায়কও ব্যাটসম্যান হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। এ রহস্য আমি উন্মোচন করতে পারি নি। আমিও আপনার মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি।

## ক্রিকেটের গল্প

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকমনে যে নামটি আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করত—তার নাম জি এল জেসপ্। তখনকার দিনে জেসপ্ ছিলেন সকলের প্রাণের বলিষ্ঠ আকার, বিশাল বক্ষ, চওড়া কাঁধ এবং কঠিনতম প্রতিজ্ঞা নিয়ে দর্শকদের রেশমী টুপিগুলোর মাঝখান থেকে হাল্কা নীল রঙের টুপি পরিহিত সেই মানুষটি যখন বেরিয়ে আসতেন তখন। দর্শক উঠে দাঁড়িয়ে করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দিত করতেন তাদের সত্যিকারের মনের মানুষটিকে।

জেসপ্ কিন্তু ধীরগতির যুগের মানুষ ছিলেন। তবুও তার ব্যাটিং প্রতিভা ছিল অলৌকিক উপাখ্যানের মতো। দ্রুতবেগে উইকেটে এসে গার্ড নিয়ে মাঠের চারদিকে একবার দ্রুত দৃষ্টিনিক্ষেপ করে উইকেটে দাঁড়াতেন, যেন পাথরের মূর্তি। মাঠের সর্বত্র তখন রুদ্ধশ্বাস নীরবতা।

তাঁর ব্যাটিংয়ের সময় বিপক্ষ অধিনায়ক হাত নাড়িয়ে তার ফিল্ডারদের বাউণ্ডারী সীমানার কাছে পাঠিয়ে দিতেন, ফিল্ডাররা অধিনায়কের নির্দেশে পিছু হঠতেন। তাঁর রানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত ঘুরতে পারেনি। ব্যাট হাতে মাঠে নামলেই ঘন্টায় ৮০র ঘরে রানের কাঁটা থরথর করে কাঁপত। বিপক্ষ ফিল্ডাররা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবতেন, 'দুর ছাই, বাউণ্ডারীটা বড্ড কাছে।'

প্রথম শ্রেণীর খেলায় জেসপ তাঁর জীবনে দুবার ১৫ মিনিটে ৫০ রান করেছেন। দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ডটি তারই গড়া। ১৯০৭ সালে জেন্টলম্যান অব্ সাউথের পক্ষে তিনি ৬৩ মিনিটে ১৯১ রান করেন। একঘন্টা বা তারও কম সময়ে তিনি মোট ১১বার শতরান করেছেন। তিনি কোন পরিস্থিতিতেই তাঁর খেলার চরিত্র বদলান নি। কারণ তাঁর ২১ বছরের ক্রীড়াজীবনের সবসময়ই তিনি গড়ে ঘন্টায় ৮০ রান করেছেন, যা যেকোন ক্রিকেটারের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, তাঁর এই দীর্ঘ ক্রিকেটজীবনে তিনি একবার ভিন্ন কখনো তিন ঘন্টার বেশী উইকেটে ছিলেন না। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ সময়ের মধ্যেও তিনি পাঁচটি ডবল সেঞ্চুরী করেছেন এবং মাত্র ১৪টি ক্ষেত্রে তিনি দু ঘন্টা বা তার সামান্য বেশী কিছু সময় উইকেটে ছিলেন। তাঁর সর্বমোট সেঞ্চুরীর সংখ্যা ? —৫৩টি।

রতন ভট্টাচার্য

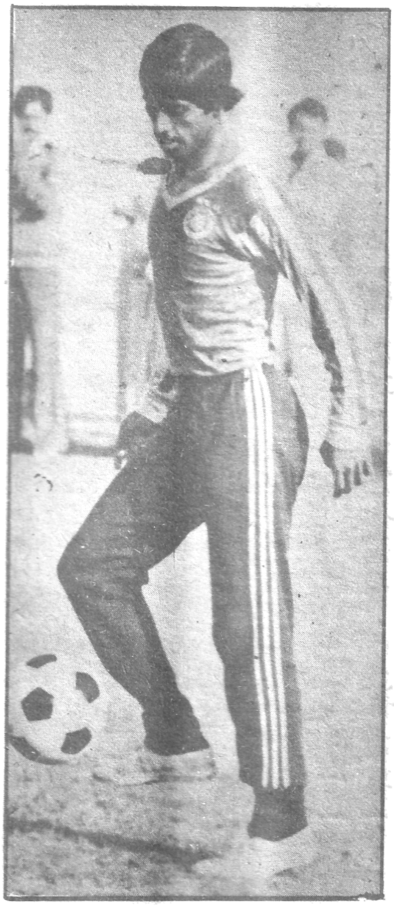
# মাঠের ডায়েরী

সল্ট লেকের ফুটবল ক্যাম্প ঘিরে হৈ-চৈ এখন এতই তুঙ্গে যে ছোটখাটো মজার ব্যাপার কারো চোখেই পড়ার কথা নয়। ক্যাম্পের প্রথম থেকেই বেশ কিছু অভিভাবক দেখা গেছে। দু-একজনের হাবভাব তো রীতিমত গুরুগম্ভীর এবং ততোধিক হাস্যকর। কোনো প্লেয়ার যাতে বাইরের কারো সঙ্গে কথা না বলে সেজন্য ভদ্রলোকের চোখে যেন ঘুম নেই। অথচ বড় ক্লাবের কর্মকর্তারা, বিশেষ করে একটি ক্লাবের রিক্রুটিং অফিসাররা অনায়াসে ক্যাম্পে নিজেদের কাজ দেখিয়ে গেলেন এবং মংগলবারের সেই অভিশপ্ত রাত্রে স্থানীয় ফুটবলারদের সংগে দুজন ভিনরাজ্যের ফুটবলারকেও বগলদাবা করে নিয়ে গেলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, উপরোক্ত মাঝারি কর্মকর্তার মুখ চোখ এখনও আগের মতোই গম্ভীর, যেন কত দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। এই ভদ্রলোকই একদা পাটনায় বাংলা দলের কর্মকর্তা হিসেবে গম্ভীর মুখে রিকসার অর্ধেক ভাড়া শ্যাম থাপার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ মাঠ থেকে হোটেলে শ্যাম ফিরছিল এক নেপালী বন্ধুর সাথে—যে খেলোয়াড় নয়। শ্যাম অর্ধেক ভাড়া ফিরিয়ে দিয়েছিল। এবং তিনি ফেরৎ নিয়েছিলেন—যথোচিত গাম্ভীর্য সহকারে।

অমল দত্ত



পি কে ব্যানার্জি এবং অরুণ ঘোষ ভারতীয় ফুটবল দলের ক্যাম্পে ব্যস্ত। ভারতের আর এক প্রখ্যাত কোচ অমল দত্তকে এ আই এফ এফ প্রয়োজনীয় মনে করেন নি। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক হত যে কলকাতার তিন প্রধানই অমল দত্তকে চাইছে। কিন্তু তিন ক্লাবই নাকি তিনটি বিভিন্ন কারণে অমল দত্তর সংসর্গ এড়িয়ে চলতে চান। কারণ বোধহয় একটাই—অমল দত্ত কারো হাতের পুতুল হয়ে থাকবেন না।

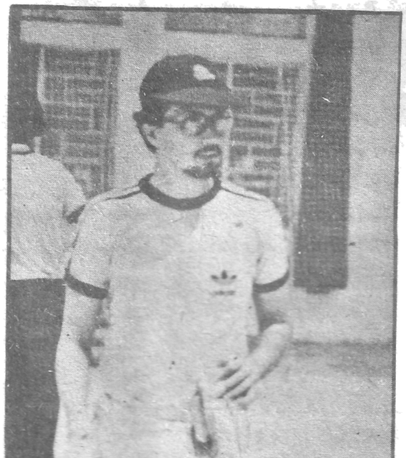


## বিদেশের সময়

বিদেশ বসুর গত এক বছর সত্যিই জটিল এবং ঘটনাবহুল। সুখ এবং দুঃখের এত ঘটনা সারা জীবনে অনেকের ক্ষেত্রে ঘটে কিনা সন্দেহ। প্রথমে বিদেশের বিয়ের ফুল ফুটল। আমরা কব্জি ডুবিয়ে খেলাম। যতীন চক্রবর্তী একজনের অটোগ্রাফ খাতায় লিখলেন 'লং লিভ মোহনবাগান।' আরো কতো কী। কিন্তু তারপর ফুটবল মরশুমেই ঘটল অঘটন। দিলীপ পালিতের সংগে বিসদৃশ ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার দিন ইডেনে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটল। এবং বিদেশকে আই এফ এ এক বছরের জন্য সাসপেণ্ড করল। বিধ্বস্ত অনুতপ্ত বিদেশ অবশ্য সেই দুঃসময়ে ফুটবলারদের পাশে পেয়েছিল। পেয়েছিল শৈলেন মান্নাকেও। মোহনবাগান ক্লাবও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ায় বিদেশ দারুণ ভেঙে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিদেশকে মাত্র তিনটি ম্যাচের জন্য সাসপেণ্ড করা হয়। রোভার্সের তিনটি ম্যাচেই বিকল্প উইঙ্গার উলাগা দারুণ খেলল। বিদেশ স্তরেও পড়ল। রোভার্সে একদিনও খেলা হলনা। ডুরাণ্ডেও গণ্ডগোল ছিল। তবু ফাইনালে একটি অসাধারণ গোল করে শেষ হাসি বিদেশই হাসল। সন্তোষ ট্রফিতেও গোল পেল এবং সন্তোষ ট্রফি চলার সময়ই পেল সেই শুভ সংবাদ—মিসেস বিদেশ বসু একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সুখী বিদেশ বসুর আর একটি সুখস্বপ্ন ছিল—একাশিতে মোহনবাগানের অধিনায়কত্ব। সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। আপনারাই বলুন, গত এক বছরে বিদেশের সময় কেমন গেল? কেমন যাচ্ছে?

## অপারেশন—সি এ বি স্টাইল

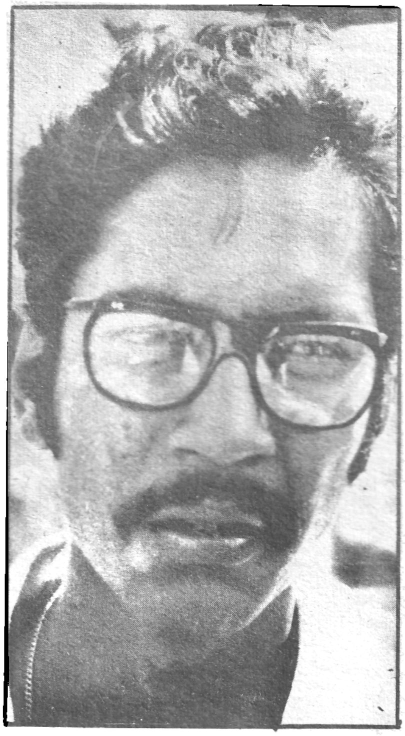
নির্বাচকরা আসেন। নির্বাচকরা বদলান। কিন্তু বাংলা তথা পূর্বাঞ্চলের কায়দাকানুন এই-রকম থেকে যায়। মনে আছে, কীভাবে রাজা মুখার্জিকে সরানো হয়েছিল? উনআশিতে ওড়িশার বিরুদ্ধে রাজা বাংলার পক্ষে সর্বোচ্চ ৪০ রান করে কোনরকমে ম্যাচ জিতিয়েছিল। খেলার পর এক নির্বাচক রাজাকে বলেন, "তোর তো পায়ে লেগেছে, পরের ম্যাচটা তাই খেলিসনা।" রাজা বলে, "চোট থাকলে কী-করে খেললাম? আমি পরের ম্যাচে খেলতে পারব।" নির্বাচক ভদ্রলোক বলেন, "না না, পারবিনা।" সেই ম্যাচে রাজাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এমন বিশ্রাম যে পরে বোঝা গেল, এটিই ছিল রাজার জীবনের শেষ রঞ্জি ম্যাচ। এরিয়ান ক্লাবের এক কর্মকর্তার কোপে পড়ে রাজাকে বাংলার অধিনায়কত্ব খোয়াতে হল। বাংলা দলে রাখা হল বটে, কিন্তু আসাম ম্যাচের সময় রাজুকে বিশ্রাম দেওয়া হল—মাথায় চোট থাকায়। পরে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে রাজুকে ডাকা হয়। কিন্তু পূর্বাঞ্চল দল থেকে রাজুকে একেবারেই বাদ দিয়ে দেওয়া হল। তার ফল দলীপ ট্রফি ফাইনালে পাওয়া গেছে। এবং এই আশঙ্কা বোধহয় অমূলক নয় যে, সামনের বার প্রথম থেকেই বাংলা দল থেকে রাজুকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে, চলবে।



# পূর্বাঞ্চল আর কবে জিতবে ?

অলক চট্টোপাধ্যায়

খেলাটিকে ঘিরে আমাদের প্রত্যাশা থাকা অসঙ্গত ছিল না কারণ অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করার পর ফাইনালে বর্তমান পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি পূর্বাঞ্চলের নেই একথা আমরা কল্পনা করিনি। একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলা দরকার এমন সাদামাটা দলীপ ট্রফি ফাইনাল স্মরণকালের মধ্যে ঘটেনি। রণধীর সিং এবং বরুণ বর্মণের বোলিং ছাড়া পূর্বাঞ্চলের পক্ষে উল্লেখনীয় কিছু নেই। করণ দুবে এবং অনিল ভরদ্বাজ রান করেছেন বটে কিন্তু অতিরিক্ত আত্মরক্ষার প্রবণতা প্রকাশ করে সাধারণ বোলিংকে অসাধারণ করে তুলেছেন।



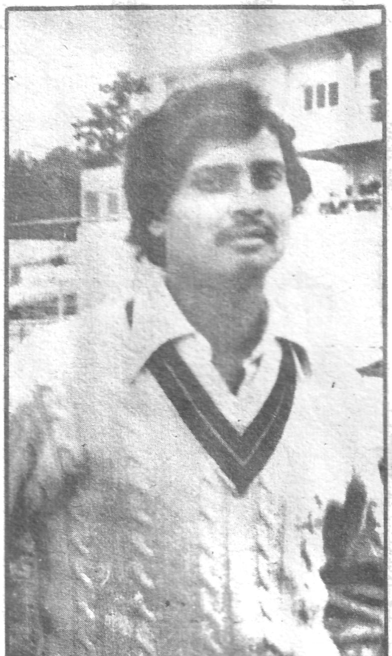
গাইকোয়াড়

টসে জিতে পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়ক অশোক মানকাদ যখন ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন উপস্থিত দর্শকরা (সংখ্যায় এত কম যে উল্লেখ না করাই ভাল। কারণ কি ? প্রচারের অভাব ?) ভাবতেও পারেননি, পরবর্তী দু ঘণ্টায় তাঁরা কি দেখবেন। বহুদিন পরে যথার্থই উঁচু দরের মিডিয়াম পেস বোলিং দেখলাম। রনধীর সিং এর সুইংয়ে বিভ্রান্ত পশ্চিমাঞ্চলের ব্যাটসম্যানরা প্রতি ওভারেই উপস্থিত সকলকে শিহরিত করেছেন। প্রথম দু ঘণ্টায় গোটা চারেক ক্যাচ ফেলেছেন পূর্বাঞ্চলের ফিল্ডসম্যানরা। রণধীরের সঙ্গী বরুণ বর্মণ শুরুতে ভালো বল না করলেও কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে ফিরে পেয়ে উপযুক্তভাবে সহযোগিতা করতে থাকেন তবে ভালো বল ফেলে বরুণ ব্যাটসম্যানদের উপর মানসিক চাপ রাখার কাজে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। দলের ১৫ রানের মাথায় রণধীরের সুইংয়ে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়ে অভিজ্ঞ অংশুমান গায়কোয়াড় বোল্ড হয়ে যান। গোলাম পারকার বার বার পরাজিত হয়ে, ক্যাচ দিয়ে অব্যাহতি পেয়ে অবশেষে দলের ৪১ রানের মাথায় রণধীরের একটা অসাধারণ আউট সুইংয়ে পরাস্ত হয়ে বলটিকে প্রথম স্লিপে মলয়ের হাতে সমর্পণ করে প্যাভেলিয়নে যেতে বাধ্য হন। পরপর অতুল মেহতা, অশোক মানকাদ ও মিলিন্দ গুঞ্জালের তিনটি উইকেট পেল বরুণ বর্মণ। এর মধ্যে অশোক মানকাদকে আউট করার ক্ষেত্রে বরুণ বর্মণের তাৎক্ষণিক চিন্তার প্রশংসা করতেই হবে। দ্রুতগতির একটা বাউন্সার মানকাদের শরীরের দিকে আসার ফলে বাধ্য হয়ে মানকাদকে ক্যাচ তুলতে হয়। ৪৭ রানে ৫টি উইকেটের পতনের পর পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থা সামলে নেন রাজু ভালেকার, রমেশ বোরদে, নারায়ণ সাথাম ও জুলফিকার পার্কার। এর সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের ক্যাচ ফেলার নৈপুণ্য তো ছিলই। পূর্বাঞ্চলের স্পিনাররা আঁটোসাটো বোলিং এর বদলে উদারভাবে বল করে এবং ফিল্ডারদের যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকার জন্য পশ্চিমাঞ্চলের কাজটা সহজ হয়েছিল।

পশ্চিমাঞ্চলের বোলিং শক্তিকে বার বার দেখার সুযোগ হয়েছিল মাসখানেক আগে সি এ বি-র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের সময়। দলে ধীরাজ পারসানা ছিলেন না। তবে বোলাররা স্থির লক্ষ্যে বল ফেলেছেন এবং ফিল্ডাররা লড়াইয়ে ফাঁকি দেননি। তবে পূর্বাঞ্চলের ব্যাটিং এর চরিত্রই ম্যাচটি পশ্চিমাঞ্চলকে উপহার দিয়েছে। সাধারণ বোলারকে সমীহ করার একটা সীমা আছে সেটা বোধহয় পূর্বাঞ্চলের ব্যাটসম্যানরা ভুলে গিয়েছিলেন। অধিনায়ক উদয়ভানু প্রায় ১৬৮ মিনিট ব্যাট করে মাত্র বারো রান করে বোল্ড হন। কোন যুক্তিতে তিনি এই ক্রিকেট খেললেন তা বোঝা গেল না। বোলার রণধীর ও বরুণ প্রাণপণে বল করে যে সুযোগ পূর্বাঞ্চলের সামনে এনে দিয়েছিলেন ব্যাটসম্যানরা তাদের অসামান্য প্রতিভায় আত্মসমর্পণ করে পরাজিত হয়।

অশোক মানকাদের পশ্চিমাঞ্চলকে অভিনন্দন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও লড়াইএর মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে ম্যাচটিকে শেষ পর্যন্ত নিজেদের আওতায় এনে ফেলার জন্য। পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন নেই—গায়কোয়াড় ও মানকাদের শতরান ছাড়া।

পূর্বাঞ্চলের দল নির্বাচন সম্পর্কে ছোট্ট একটা কথা এসে যাচ্ছে — ম্যাচের গুরুত্ব বিচার করে মিডল অর্ডারে হরি গিদোয়ানী বা রাজু মুখার্জির মত অভিজ্ঞতা কোন খেলোয়াড়কে রাখা কি উচিৎ ছিল না ? তুলনামূলকভাবে দুর্বল এই পশ্চিমাঞ্চল দলকে হারিয়ে দলীপ ট্রফি জয়ের সুযোগ কি বার বার আসবে ? দলীপ ট্রফি ফাইনালে স্কোর বোর্ড চালানোর ব্যাপারটিকে আর একটু গুরুত্ব (অভাগা রাজু ভালেকার।) দেওয়া বোধহয় উচিৎ ছিল — দ্বিতীয় ইনিংসে



বরুণ

অশোক মানকাদের আচরণ কি সি এ বিকে শিক্ষিত করবে ?

স্কোর : পশ্চিমাঞ্চল :—১ম ইনিংস—৩১৫ (পেনাল্টি ২৮ রান সহ), (রাজু ভালেকার ৯৯, জুলফিকার পারকার ৪৩, বরুণ বর্মণ ৮৮ রানে ৬ উইকেট, রণধীর ৬২ রানে ২ উইকেট, পরমজিৎ ৫০ রানে ২ উইকেট ও দ্বিতীয় ইনিংস —৪ উইকেটে ৩৪৯ (গাইকোয়াড় ১৪৭, অশোক মানকাদ ১০০ নট আউট)।

পূর্বাঞ্চল : ১ম ইনিংস—২১৪, (দুবে ৮৮, ভরদ্বাজ ৬৪, সাথাম ৫২ রানে ৫ এবং সান্দু ৬৩ রানে ৪) দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৮। ৬ উঃ।

# সল্ট লেকের ক্যাম্পে যা দেখলাম রতন ভট্টাচার্য

বাংলার ফুটবলাররা দলবদ্ধভাবে ক্যাম্প ত্যাগ করাতে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাদের নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে আপাত-দৃষ্টিতে এতগুলো ফুটবলারদের ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসা এককথায় নিন্দনীয়। কিন্তু হঠাৎ তারা ক্যাম্প ছাড়ার সিদ্ধান্ত কেন নিল, সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে হাজির হয়েছিলাম সল্ট লেকের কোচিং ক্যাম্পে।

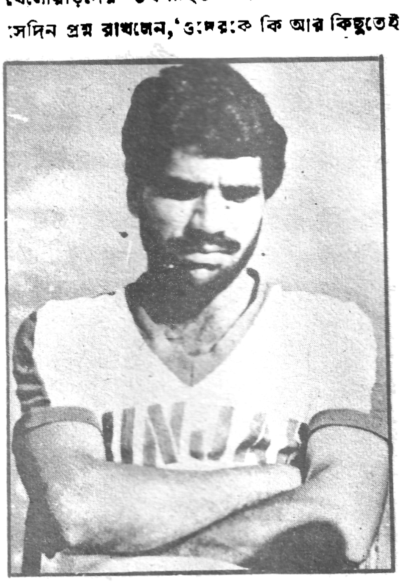
লক্ষ্য করলাম কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। খেলোয়াড়েরা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ছোটাছুটি করে নিজেদের গা ঘামিয়ে নিচ্ছেন। ওদের মধ্যেও একটা ছাড়া ছাড়া ভাব লক্ষ্য করা গেল। প্রথমদিকে মাঠে প্রচুর দর্শক আসতেন খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিতে। কিন্তু এখন মাঠে দর্শক খুবই কম। তাই কোচ পি কে-কে আর চেঁচিয়ে দর্শকদের অনুরোধ করতে হচ্ছে না, 'ওরে তোরা সরে যা, খেলোয়াড়দের ডিসটার্ব করিস না।' তিনজন অফিসিয়াল কোচের মধ্যে হাকিমকে দেখা গেলনা। পরে শুনলাম উনি হায়দ্রাবাদে গেছেন কয়েকদিন ছুটি কাটাতে। দুই টেকনিক্যাল ডিরেক্টর কিট্টু এবং বাসাকেও দেখলাম কোচিংয়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করছেন।

মাঠে যে অল্পসংখ্যক ক্রীড়ামোদী উপস্থিত হয়েছেন, তাদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখলাম। অনেকে বলছেন যে বাংলার খেলোয়াড়রা ক্যাম্প ছেড়ে অন্যায় করেছেন। আবার বলছেন যে বড় ক্লাবের অফিসিয়ালদের প্ররোচনায় ওরা ক্যাম্প ছেড়েছে। তবে ওদের কথায় ক্যাম্পের আকর্ষণ নাকি ষোলো আনাই নষ্ট হয়ে গেছে।

যারা প্র্যাকটিশ করছেন তাদেরকে চারভাগে ভাগ করে প্র্যাকটিশ করানো হচ্ছে। প্র্যাকটিশ করাচ্ছেন পি কে, বাসা, অরুণ ঘোষ ও কিট্টু। তবে দর্শকদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগই পি কের ট্রেনিং দেখছেন। পি কে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় কেউ ভুল করলে যেমন বকছেন আবার প্রয়োজনে তাদের খেলার তারিফও করছেন। সাইডলাইনের ধারে আহত এক খেলোয়াড়কে জিজ্ঞাসা করলাম, "বাংলার খেলোয়াড়দের শিবির ছাড়ায় আপনার প্রতিক্রিয়া কী?"

খেলোয়াড়টি মোটামুটিই বললেন, 'বাংলার ট্রায়ালে যারা ডাক পেয়েছিলেন তাদের বেশীর ভাগই যথেষ্ট কুশলী খেলোয়াড়। তাছাড়া বিদেশী টীমের বিরুদ্ধে খেলতে গেলে যে পরিমাণ স্কিলের প্রয়োজন, তা বাংলার খেলোয়াড়দের সহজাত। সুতরাং ওরা ক্যাম্প ছাড়াতে খুবই ক্ষতি হয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই যে বাকী যারা ক্যাম্পে আছেন তাদের শক্তি বাংলার খেলোয়াড়দের চেয়ে বেশী থাকলেও স্কিলে ওরা বাংলার ছেলেদের কাছাকাছিও আসতে পারবে না। আর শুধুমাত্র পাওয়ার নির্ভর ফুটবল খেলে খুব একটা ভাল ফল করা মুস্কিল।" কিট্টুকে সেদিনের বাংলার খেলোয়াড়দের ক্যাম্প ছাড়ার ঘটনা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "ওরা ক্যাম্প ছেড়েছে নিজেদের স্বার্থ এবং কলকাতার বড় ক্লাবের প্ররোচনায়। আমি হলফ করে বলতে পারি যে আজ যদি জ্যোতিষ গুহর মত কর্মকর্তা বড় দলগুলোতে থাকতেন। তবে এ ঘটনা কিছুতেই ঘটত না। আমিও একদিন বাংলার খেলোয়াড় ছিলাম, তাই এ লজ্জা আমারও। কিন্তু অফিসিয়ালরা শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেরা নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। বাংলার খেলোয়াড়রা ভারতীয় দলে না থাকলে ভারতীয় দল হয়ত চতুর্থ স্থানের জায়গায় অষ্টম স্থান পাবে, কিন্তু আগামী জাতীয় ফুটবলের আসরে এইসব ফুটবলারদের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে বাংলার যে কী দশা হবে সেকথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি। তাই আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এইসমস্ত ক্যাম্পত্যাগী খেলোয়াড়েরা ভারতের চাইতে বাংলারই বেশী ক্ষতি করলেন।"

সেদিন প্র্যাকটিশের পর পি কে-কে খুব ক্লান্ত এবং মনমরা দেখাচ্ছিল। সাইডলাইনের ধারে আসতেই অত্যুৎসাহী কয়েকজন দর্শক ওঁকে ঘিরে ধরে অটোগ্রাফ খাতা এগিয়ে দিলেন। পি কে বললেন, "ওরে আমার মন মেজাজ ভাল নেই, আমাকে আজ এভাবে বিরক্ত করিস না। পরিস্থিতির সঙ্গে একটু ধাতস্থ হতে দে, তারপর আমি নিজে থেকেই তোদের ডেকে অটোগ্রাফ দেব।" তিনি মাঠে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা রোজ মাঠে এসে এই সমস্ত অনভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করুন।" অনেকেই সেদিন প্রশ্ন রাখলেন, 'ওদেরকে কি আর কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না?' পি কে বললেন, 'সে ক্ষমতা আমার নেই। ওদের ফেরানো বা না ফেরানোর দায়িত্ব ফেডারেশনের।'



প্র্যাকটিশের পর মাঠে সামান্য বিশ্রামের ফাঁকে দুই একজন গোয়া, পাঞ্জাব এবং অন্ধ্রের খেলোয়াড়কে আলাদাভাবে তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চাইলাম। প্রত্যেকে আলাদা হলেও মোটামুটি একই উত্তর দিলেন। বললেন, "আমরা খুব খুশী হয়েছি।" কারণটা অবশ্য তারা খুলে বলেন নি। তবে তাদের প্র্যাকটিশের ঢিলেঢালা ভাব দেখে কারোরই বুঝে নিতে অসুবিধে হবেনা যে গোলে সুরজিৎ সিং, বলমন বা মুসা প্রভৃতিদের আর দিলীপ-ভাস্করদের টেক্কা দিতে হবেনা। ব্যাকে নিকোলাস-পারমারদের ও সুব্রত-মনোরঞ্জনদের সাথে পাল্লা দেবার প্রয়োজন নেই। হাফে হেমা রাও, রবি ভূষণ ও পারমিন্দারকেও আর লড়তে হবে না গৌতম, প্রসূন ও প্রশান্তর সাথে। ফরোয়ার্ডে মানস, বিদেশের গতির ঝাপটা বা আকবরের দুরন্ত শুটিংয়ের সঙ্গে শেখর-মুজাফ্ফর-কাশ্মীরাদের আর যুদ্ধ করার দরকার হবে না। সুতরাং এইসব খেলোয়াড়দের টীমে ঢোকার জন্য অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়ে নিদ্রাহীন কালক্ষেপণ করতে হবে না।

সামান্য বিশ্রামের পর খেলোয়াড়বহনকারী লরীটি যাত্রা করল 'করুনাময়ী' ফ্ল্যাটের দিকে পিছনের জীপে আমিও চললাম পি কে বাসা এবং ফেডারেশনের এক কর্মীর সঙ্গে ঐ ফ্ল্যাট অভিমুখেই। পি কে জানালেন যারা ক্যাম্পে আছেন তাদের জন্য পি কের বাড়ী থেকে কয়েক হাঁড়ি মিষ্টিও এসেছে। জীপে যেতে যেতেই পি-কে কে প্রশ্ন করলাম সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে। তিনি কিছুটা বিষন্নভাবেই বললেন, "ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক।"

কিন্তু শুধুমাত্র পি কের এই কথাটা শোনার জন্যই যে আমি এখানে আসিনি তা বুঝতে ওর কোন অসুবিধাই হলো না। তিনি বললেন, "যারা গেছে তাদের সকলের জন্য আমার দুঃখ নেই ঠিকই, তবে সমরের চলে যাওয়াটা আমাকে খুবই ব্যথিত করেছে। ও অত্যন্ত গরীব ঘরের ছেলে। চার বছর আগে আমি ওকে ইস্টার্ণ রেলে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আজ ও আমাকে যোগ্য জবাবই দিয়েছে। আমার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ও যখন চলে গেল, তখন আর চোখের জল ধরে রাখতে পারি নি।"

ইতিমধ্যে লরীর পিছনের জীপ গাড়ীটাও এসে হাজির হয়েছে যথাস্থানে। সুতরাং গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। দেখলাম ফেডারেশনের আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই। খেলোয়াড়রা সকলেই হাল্কা খাবার খেয়ে স্নানের ঘরের দিকে পা বাড়াল। পি কে বসলেন সামনের একটি লনে। মুখোমুখি বসেই প্রশ্ন ছুঁড়লাম



'ওদের ক্যাম্পত্যাগের সঠিক কারণ তো আপনি বলবেন না।' পি কে বললেন, "প্রথমত ওদের অনেকেই প্র্যাকটিশে বাইরের খেলোয়াড়দের কাছে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, যা থেকে ওরা ভয় পেতে শুরু করে। তার ওপর অনেক কর্তাব্যক্তিদের প্ররোচনাতো আছেই। তবে আমার ধারণা ওদের মধ্যে ৬-৮ জন ছাড়া বাকীদের দলের কাজে লাগত না।"

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে যাদের কাজে লাগবে না, তাদেরকে শুধু শুধু ক্যাম্পে রাখা কেন? এতে অর্থেরও যথেষ্ট অপচয় হয়েছে। আর ক্যাম্পের বাতিল খেলোয়াড়রা যদি বড় ক্লাবদের থেকে কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারেন তাতে আপত্তির কী আছে?

এত প্রলোভন সত্বেও বিশ্বজিৎ যে ক্যাম্পে থেকেছে তার জন্য অভিনন্দন তার অবশ্যই প্রাপ্য। কিন্তু আবার শোনা গেল যে ও নাকি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু অরুণ ঘোষ ওকে প্রায় জোর করেই ধরে এনেছেন। ক্যাম্পত্যাগী খেলোয়াড়েরা যে গালাগালি করেছেন সে ব্যাপারে পি কে বললেন, "আমি কিছুই শুনিনি, তবে অরুণ আমাকে বলেছে যে ওরা নাকি বাইরে গালাগালি দিয়েছে।" অরুণ ঘোষ এ ব্যাপারে মুখ খুললেন না। আমরা চাই যারা ক্ষুদিরামকে অপমান করেছে তাদের শাস্তি হোক। সুতরাং দেশের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ করা হোক। কিন্তু ক্যাম্পের এক কেয়ার টেকার জানিয়েছেন যে, যারা গালাগালি দিয়েছে তারা বাইরের লোক। তবে ক্ষুদিরামকে নিয়ে কোন গালাগালির কথা তিনি শোনেন নি। স্থানীয় লোকজনও সেদিন রাত্রের খেলোয়াড়দের ক্যাম্প ত্যাগের ব্যাপারটা কিছুই জানতেন না। সেদিন যা ঘটেছে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবেই ঘটেছে।

এই লেখা সকলের হাতে পৌঁছবার আগে বা পরে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই লেখা শেষ করছি।

# আবোল তাবোল

আপনারা কতোজন কতোখানি অবহিত আছেন জানিনা, তবে কলকাতা ময়দানে অতি সম্প্রতি একটি 'দেশপ্রেমিক ক্লাব' স্থাপিত হয়েছে। এই ক্লাবের বিশেষত্ব হল এই যে এতে যেকোনো মতের, যেকোন ক্লাবের, যেকোন পেশার লোক যোগ দিতে পারেন। একটা দেশপ্রেমিক বোর্ড লেখার দোকানে সাইন বোর্ড লিখতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেশপ্রেমিক দোকান-মালিক পুরো টাকা অ্যাডভান্স চাওয়ায় ডেলিভারী নেওয়া হয়নি, কাল-পরশু এসে যাবে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই সাইনবোর্ড সর্বতোভাবেই চিন-প্রুফ।

এই ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য দিন তিনেক আগে 'দেশপ্রেমিক ক্লাবটেন্টে গিয়েছিলাম। ঢোকার মুখেই দেশপ্রেমিক ক্লাব কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা হল। নাকে সুগন্ধী রুমাল চেপে তিনি জানালেন, দেশের জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে তিনি প্রস্তুত। ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট খুলতে খুলতে তিনি বললেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই'। সিগ্রেটটা অবশ্যই মাথায় নয়, ঠোঁটেই উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার ক্লাবতো কোনদিনই জাতীয় দলে প্লেয়ার ছাড়তে চায়নি, হঠাৎ দেশপ্রেমিক হয়ে গেলেন কেন?"

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে চলে যেতেই যাকে এগিয়ে আসতে দেখলাম তিনি একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। আই মিন, দেশপ্রেমিক সাংবাদিক। সঙ্গী সাংবাদিককে তিনি বলতে বলতে আসছিলেন, "ক্রচের হ্যাং-ওভারটা কম, এটাতো মানতেই হবে...।"

—"আপনি হঠাৎ দেশপ্রেমিক হয়ে গেলেন কেন?"

—"ছোটবেলায় বইপত্র পড়ে একটা ভুল ধারণা জন্মেছিল যে দেশপ্রেমিক হতে গেলে অনেক কষ্টটষ্ট করতে হয়। কিন্তু এখন দেখছি সবরকম আরাম বজায় রেখেও দেশপ্রেমিক হওয়া যায়। বিশ্বাস করুন, আমি ভাবতেই পারিনি যে কয়েকজন ফুটবলারের বিরুদ্ধে পাবলিক ক্ষেপিয়ে দিতে পারলেই আগমার্কা দেশপ্রেমিক ডিপ্লোমা পাওয়া যাবে। আমি যে এখন কী খুশি...।"

টেন্টের লনের এক কোণায় বেঞ্চে যে ভদ্রলোক ঝিমিয়ে বসেছিলেন, তাকে আমি চিনিনা। জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু মনে করবেন না, আপনি কে?" ভদ্রলোক নাকে আতর দেওয়া পরিমল নস্যি গুঁজে বললেন, "আমি দেশপ্রেমিক সমর্থক। কোনদিন ক্লাব ছাড়া কিছু বুঝিনি। বৃদ্ধ বয়সে দেশপ্রেমিক হবার সখ হয়েছে, আর কিছু জানিনা, ব্যাস।"

আর দুজন অচেনা ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কারা?" শার্টের হাতা গুটোতে গুটোতে ওদের মধ্যে একজন বললেন, "আমরা দেশপ্রেমিক দাদা।"

—"দাদা, তার মানে?"

—"মানে, প্লেয়ারের দাদা। আমরা প্লেয়ারদের দেশপ্রেমিক দাদা। ঘটনাচক্রে আমাদের ভাই দেশপ্রেমিক বনে যাওয়ায় আমরা দেশপ্রেমিক দাদা হিসেবে খ্যাতি পেয়েছি। ইয়ার্কি নয়, কাগজে আমাদের ডায়ালগও আজকাল ছাপা হয়।"

কিছুক্ষণ পর দেশপ্রেমিক ক্লাবের ইমার্জেন্সি মিটিং শুরু হল। আমাকেও বসতে দেওয়া হল—দেশপ্রেমিক 'ফ্লানভ্যু' হিসেবে। এক দেশপ্রেমিক প্রাক্তন ফুটবলার বললেন, 'চিরকাল দেশের চেয়ে ক্লাবকে বড় করে দেখেছি। রিটায়ার করার পাঁচ বছর পরে নিজেকে দেশপ্রেমিক ভাবার সুযোগ পেয়ে সত্যিই ভাল লাগছে। আমার প্রস্তাব, এর পর থেকে সেই সব ব্যাঙ্কে আর কেউ টাকা রাখব না। —যেখানে এইসব দেশদ্রোহী ফুটবলাররা কাজ করে।" আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, "একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলেন: "কীসের বাড়াবাড়ি? জানেন, চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় চীনেবাদাম খাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, সেটা বাড়াবাড়ি? এক স্কুলের দেশপ্রেমিক সেক্রেটারি এক ভদ্রলোককে মাস্টারির চাকরি দেননি কারণ তাঁর নাম ছিল শচীন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন চাকরি দেননি?"

—"কেন আবার, নামের মধ্যেই চীন যে।"

—বাবুরাম সাঁপুড়ে

## জিমন্যাস্টিকস্ ও যোগব্যায়াম প্রদর্শন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সম্প্রতি জাতীয় যুব সংঘের ৫০ বর্ষপূর্তি উৎসবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল দর্শনীয় জিমন্যাস্টিকস্ ও যোগব্যায়াম প্রদর্শনী। মূলত কিশোর-কিশোরীদের নিয়েই এই অনুষ্ঠান। ওদের দক্ষতা বিপুল দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রশংসা আদায় করে ফুলেন্দু, ভগতী, পদ্মনাভ, বল্লভভাই, সুশান্ত, প্রদীপ, সুব্রত, বিদ্যুৎ, বীরেন্দ্র, লক্ষ্মী, জয়ন্ত, গৌতম, সঞ্জয়, শুভেন্দু, শান্তনু, কিশোর, বুবু, আশাপ্রসাদ প্রমুখ। পশ্চিমবাংলার জিমন্যাস্টিকস্ এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিলীপ ব্যানার্জি, সাংবাদিক চিরঞ্জীব ও ফুটবলার প্রশান্ত ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন অতিথি হিসেবে।

# মজিদ না থাকলে জামশিদ কতটা সফল হত ? / সরোজ চক্রবর্তী

তর্কটা শুরু হয়েছিল আমাদের সহকর্মীদের মধ্যে। ডি সি এম ট্রফি শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে আলোচনাটা আমাদের 'খেলার কাগজ' অফিসে ঘন্টাখানেক চলল একজন বলল, 'যদি একা মজিদ ইস্টবেঙ্গলে আসত তাহলে খুব একটা সাকসেসফুল হতে পারতনা।' মজিদ জামশিদ আলিগড়ে একসঙ্গে ওঠবসা করার জন্য এবং ইরাণ থেকে আলিগড়ে ওদের বন্ধুত্ব ও ফুটবল টীমে একসঙ্গে থাকার ফলে একটা বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল। মজিদের ধরণ-ধারণ এবং জামশিদের দক্ষতা—সবকিছুর সুন্দর এক বোঝাপড়ার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল টীমের ফরোয়ার্ড লাইনটিতে প্রাণ ফিরে এসেছিল। মজিদের একার পক্ষে ইস্টবেঙ্গল টীমের ফরোয়ার্ড লাইন-টিকে কিছুতেই সাজিয়ে তুলতে পারত না। মজিদকে অসহায়ের মতো লাল-হলুদ জাসি পরে ছুটতে হত। মজিদ আজ যতটা ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ততটা হতে পারত কিনা সন্দেহ।

এই যুক্তিগুলো ধূলিসাৎ করার জন্য দ্বিতীয় সহকর্মী বলল, "মজিদ একা আসলেও কল-কাতার মন জয় করতে পারত। বরং জামশিদ এসে নিজেকে বড় করে তুলল মজিদের দৌলতে। আলোচনাটা অনেকদূর গড়াত। কারণ, দুজনই অনেকগুলো উদাহরণ টেনে নিজেদের যুক্তিকে শক্তিশালী করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ডি সি এম-এ গিয়ে প্রসঙ্গটা স্বয়ং পি কে ব্যানার্জির কাছেই তুলেছিলাম। পি কে এক কথায় প্রসঙ্গের ইতি টানলেন, "জামশিদের চেয়ে মজিদ হাজার গুণ ভাল প্লেয়ার। জামশিদ সঙ্গে না থাকলেও মজিদ কলকাতায় সমান জন-প্রিয়তা অর্জন করত। মজিদ যেভাবে বল ভাসিয়েছে তাতে যে-কেউ গোল করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস। জামশিদের পিছনে আমাকেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। তবে জামশিদের গোল করার গুণটা যথেষ্ট রয়েছে।"

জামশিদের সঙ্গে মজিদের আলাপ আলিগড়ে এসেই। একই বিষয় নিয়ে পড়তে দুজনই ইরাণ থেকে এসেছিল। মজিদের বাসস্থান থেকে জামশিদের বাড়ি প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় টীমে ওরা পাশাপাশি খেলতে শুরু করে। তারপর যখন ইস্টবেঙ্গলে আসার কথা ওঠে তখন জাম-শিদই উদ্যোগ নিয়ে মজিদকে রাজী করিয়েছিল। এবং খাবাজীর ভূমিকাও যথেষ্ট ছিল।

রোভার্সে একদিন সন্ধেবেলায় ওদের দু-জনকে 'সেট অফ ইণ্ডিয়া'তে পেয়ে গিয়েছিলাম। তার আগের দিন দুই প্রধানের প্রথম দেখা ব্রাবোর্নের মাঠে হয়ে গিয়েছিল। 'খেলার কাগজের' হয়ে লেখার কথা (১৬ ডিসেম্বর



সংখ্যায় সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল) বলতেই হেসে উঠেছিল মজিদ বাসকার। তারপর এককথায় রাজীও হয়ে গিয়েছিল। সেই সব কথার ফাঁকে মজিদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'যদি জামশিদ না আসত তাহলে তুমি কলকাতায় এতটা ভালো খেলতে পারতে ?' এবারেও সেই শব্দহীন হাসি ওর মুখে দেখা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জামশিদ উত্তর দিল, "মজিদ না থাকলে আমি কলকাতায় একা আসতামই না। মজিদ-কে আমি গুরু বলে মানি। ও অনেক বড় ফুটবলার। ওর পাশে খেলার সুযোগ পাওয়া আমার সৌভাগ্য। কলকাতার মানুষ আমাকে যতটা ভালবেসেছে তার জন্য সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মজিদের।" মজিদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল জামশিদকে থামিয়ে। কিন্তু জামশিদ বলার সুযোগ দিল না। বলতে শুরু করল, "আমাদের দুজনের মধ্যে এত সুন্দর বোঝাপড়া আছে যে আমরা একজন আর একজনকে ছাড়া কলকাতায় খেলার কথা ভাবতে পারি না।" এবার মজিদ মুখ খুলল হাসতে হাসতেই। "জামশিদের খেলাও আমার খুব ভালো লাগে। ওর মনটা এত ভালো, তার জন্যই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বেশী করেই হয়েছে। আমার খেলার ধরণটা জামশিদ ধরতে পারে। আমি কোথায় বল দেব, ও আগে থেকেই বুঝতে পারে। আমার চেয়েও ওর গোল করার ক্ষমতা অনেক বেশী। জামশিদ ভালো স্ট্রাইকার। ইস্টবেঙ্গল টীমে হায়েস্ট স্কোরার জামশিদই।"

রোভার্স থেকে ফেরার মাস খানেক পরে একদিন অরুণ ঘোষের সঙ্গে জামশিদ নিয়ে কিছুক্ষণ কথাও হয়েছিল। জামশিদ সম্পর্কে অরুণ ঘোষ খোলাখুলিই বলেছিলেন, 'ফেডা-রেশন কাপে ওকে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক উন্নত খেলা দেখলাম রোভার্সে। বলটা ধরে খেলছে। হেডিং ভালো। পাস নিখুঁত করছে। ওকে যতটা খারাপ প্লেয়ার মনে করে-ছিলাম, সেই ধারণা এখন পাল্টাতে বাধ্য হচ্ছি। মোহনবাগান টীমের বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচই সে দারুণ খেলল। একসময় মজিদের চেয়েও ওকে মারাত্মক মনে হচ্ছিল।"

জামশিদ কিছুটা মুডি খেলোয়াড়। এবং ছটফটে। এই মরশুমে ওরা আবার কলকাতায় খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। গত বছরের চেয়ে এই বছরে ওকে আরো অনেক পরিণত মনে হবে নিশ্চয়। মজিদের বিপুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি জামশিদ তার জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করে না। বোম্বাইয়ে ওর শেষ কথা দিয়ে এই লেখা শেষ করছি। "কলকাতার ফুটবল প্রেমিক গোল করতে পারলেই খুশী হয়। আমি গোল করেই ওদের মন-জয় করতে চাই।"

দিল্লী শহরে মজিদ-জামশিদদের প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে ইস্ট-বেঙ্গলের জনৈক কর্মকর্তা। নির্বাচনে জিতবেন—এই নিশ্চয়তা নিয়ে নিশীথবাবু তাঁর লোকেদের প্রথম নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন করেই হোক মজিদদের পাহারা দাও। সেই কথামত একজন কর্মকর্তা জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে আলিগড়ে পৌঁছে ওদের 'সব শর্ত' মেনে নিয়ে মোটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছেন এবং আরো দু একজন ইরাণীকে ইস্টবেঙ্গলে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন।

ইতিমধ্যে, ইরাণের জুনিয়র ন্যাশনাল টীমের একজন হাফের সঙ্গে খাবাজীর কথাও নাকি প্রায় পাকা হয়ে গেছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল সম্পাদক প্রশান্ত ঘোষ বললেন, "মজিদ-জামশিদের ব্যাপারে আমরা হানড্রেড পারসেন্ট কনফার্মড। মহ-মেডান ক্লাব কিছুতেই ওদের পাবে না। ওদের পারমিশন নিশীথদা যোগাযোগ করে ঠিক করে ফেলেছেন। আনন্দবাজারে কী বেরিয়েছে সে নিয়ে আমরা মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। আমরা কয়েকদিনের মধ্যেই সেটা প্রমাণ করে দিচ্ছি।"

# ফিজি দ্বীপে কেমন ক্রিকেট খেলা হয়?

দেবাশিস দত্ত

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। নিউজিল্যাণ্ড সফরের শেষে ভারতীয় ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম ফিজি দ্বীপে আমন্ত্রণী ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছে। এর আগে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের শুভেচ্ছা সফরে ফিজি দ্বীপবাসীদের উৎসাহিত করে এসেছে। গাভাসকারের নেতৃত্বে এই প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট দল ফিজি দ্বীপ সফরে যাচ্ছে।

১৯৬৫ সালে 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সে'র মিটিংয়ে 'ফিজি দ্বীপ' এ্যাসোসিয়েট মেম্বারের সম্মান পায়। ৩০০টি ছোট বড় দ্বীপ মিলিয়ে "ফিজি দ্বীপ"। বর্তমানে ফিজির লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। এই ৬ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র এক হাজার খেলোয়াড় ক্রিকেট খেলে থাকে। প্রশ্ন জাগতে পারে, এই বিশাল দ্বীপে খেলোয়াড়ের সংখ্যা এত কম কেন? প্রমাণ সাইজের মাঠের অভাব, ঘাসবিহীন মাঠ এবং এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাতায়াতের অসুবিধাই এর আসল কারণ। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের প্রবল উৎসাহের ফলে ফিজি দ্বীপে ক্রমশ ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে। গত বছর ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত আই সি সি ট্রফিতে ফিজি দ্বীপের যোগদানের ফলেও ক্রিকেটের প্রতি ফিজিয়ানদের আকর্ষণ বেড়েছে।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ডাচ এক্সপ্লোরার তাসমান ফিজি দ্বীপ আবিষ্কার করার পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুক ফিজি দ্বীপ ভ্রমণ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিজি দ্বীপের রুলিং চীফের অনুরোধে ব্রিটিশরা ফিজি দ্বীপ শাসন করতে শুরু করেন।

মাত্র ৭ বছর সুশৃঙ্খল পরিচালনার পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পঞ্চম জর্জ ফিজিয়ানদের ক্রিকেট খেলার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। উত্তরপর্বে ইংলণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া পারস্পরিক শুভেচ্ছা সফরের মাধ্যমে ক্রিকেটকে ফিজি দ্বীপে ক্রমশঃ জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেছে। প্রথমদিকে ফিজিয়ানরা এ খেলার প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেখান নি। ১৮৯৫ সালে ফিজিয়ান এটর্নি জেনারেল জে এস উদাল সর্বপ্রথম নিউজিল্যাণ্ডে একটি ক্রিকেট দল নিয়ে যান। সেই শুরু। এরপর বহুবার নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় ফিজি দ্বীপ থেকে ক্রিকেট দল পাঠান হয়।

১৯৪৬ সালে অলরাউণ্ডার পি এ স্নো, তদানীন্তন শাসনকর্তা রাতু এবং স্যার লোলা সুকুনার প্রচেষ্টায় "ফিজি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন" গঠিত হয়। সেই মরশুমে টেস্ট ক্রিকেটার সার্টক্লিফ এবং ওয়ালেসের দুই দল—ওয়েলিংটন এবং অকল্যাণ্ডকে, স্নোর অধিনায়কত্বে ফিজি দ্বীপ পরাজিত করে। সেই মরশুমে ফিজি ক্রিকেট দলে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা হলেন—আই এল বুলা, মে জে যোন, এইচ জে এপটেড, রাতু, স্যার জর্জ কাকোবাউ (সহ অধিনায়ক), স্যার এডোয়াড, ভিলিয়েম মাতাইকা, আইসোয়া লোঙ্গাভাটা এবং কামিনিলী এরিয়া। ১৯৫২ সালে পি এ স্নোকে এম সি সির তরফ থেকে অনারারী লাইফ মেম্বারের সম্মান দেওয়া হয়।

নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মিস্টার ডব্লু এ হ্যাডলীর মতে ১৯৪৮-র ফিজি দল সবচেয়ে শক্তিশালী। প্রাক্তন ইংলণ্ড ক্রিকেটার ও উস্টারশায়ারের অলরাউণ্ডার মারটিন হরটন সে মরশুমে ফিজি দলের ক্রিকেটারদের অনুশীলন করিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ফিজিয়ানদের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেছেন বুলা। তিনি ২৪৬ রান করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেছেন ভিলিয়েম লোঙ্গাভেট্টু (অপরাজিত ২১৪)।

এই ভিলিয়েম পরিবার সম্পর্কে দু-চার কথা বলি। প্রমিসিং ক্রিকেটারদের কীভাবে প্রথম শ্রেণীর লেভেলে তুলে আনা যায়, সে বিষয়ে মিস্টার ভিলিয়েম সদাতৎপর। কাজের বাইরে সব সময়ে ভিলিয়েম নতুন প্রতিভা খুঁজে বেড়ান। পুত্র আইসোয়ার পিছনেও অনেক সময় ব্যয় করেন। ফিজিয়ানদের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বাধিক উইকেট (এক ইনিংসে) দখলের নজীরটিও ভিলিয়াম পরিবারের ঘরে। আইসোয়ার ৮ রানে ১০ উইকেট এবং স্নোর ১০ রানে ১০ উইকেট এখনও অন্য ফিজিয়ান বোলাররা ভাঙতে সক্ষম হয় নি।

এতো গেল ফিজি দ্বীপের জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত নজীর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের কিছু রেকর্ডের পাশে নিজেদের নাম লেখাতেও ফিজিয়ানরা পেছিয়ে থাকে নি। নাথানিলী উল ইভিতি ৭টি ছয় ও ১৫টি বাউণ্ডারীর সাহায্যে ৩৬ মিনিটে সেঞ্চুরী করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দ্রুততম সেঞ্চুরীর লিস্টে দ্বিতীয় হন। ওটাগোর বিরুদ্ধে নাথানিলী এ সেঞ্চুরী করেন। নাথানিলী '৬৭-'৬৮ মরশুমে ম্যানেজার কাম ক্যাপ্টেন হয়ে নিউজিল্যাণ্ডে গিয়ে এ নৈপুণ্য দেখান। সে সফরে নাথানিলী অন্য ইনিংসগুলোও ছিল উল্লেখযোগ্য। ২৫ মিনিটে ৬৮, ২৫ মিনিটে ৭১ এবং ২৪ মিনিটে ৫৩ রান করে দর্শকদের আনন্দ দেন। শুধু ব্যাটেই বিক্রম দেখান নি, সে সফরে ৬৫টি উইকেট নিয়ে বোলারদের তালিকার শীর্ষস্থান দখল করেন। আর একজন আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান এবং দ্রুত গতির বোলার তুরাঙ্গা ১৯৪২ সালে শক্তিশালী নিউজিল্যাণ্ড ফোর্সের বিপক্ষে ১৬ রানে ৬টি উইকেট পান। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট না হলেও সে মরশুমে তুরাঙ্গা ২৮ মিনিটে একটি নয়নাভিরাম সেঞ্চুরীর ইনিংস খেলেন। ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ ডন ব্র্যাডম্যানের প্রায় অলৌকিক কাণ্ডকারখানা তুরাঙ্গা শুনে বিশ্বাস করতে চাইত না। দোভাষী তুরাঙ্গাকে পুরনো নথিপত্র দেখিয়ে বিশ্বাস করান। এ প্রসঙ্গে একটি ইংরেজী পত্রিকায় এরকম লেখা হয়েছিল, "On being told that Don Bradman was a world class batsman, he asked to be allowed to feel Don's biceps, following which he informed his enterpreter that he did not believe in what was said about Don Bradman's stature as a batsman."

১৯৪৮ এ সফরের আর একটি মজার ঘটনা শুনুন। ক্যাপটেন ফিলিপ স্নো একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। একটি খেলায় ব্যাট করার সময় হঠাৎই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। স্নো প্যাভেলিয়ন থেকে ছাতা আনিয়ে ব্যাট করতে থাকেন। একহাতে ছাতা এবং অন্যহাতে ব্যাট নিয়ে খেলা চালিয়ে যান।

বাউ দ্বীপ ফিজিদ্বীপের অন্তর্গত। বাউ দ্বীপের আয়তন বিশ্বখ্যাত লর্ডস মাঠের সমান। লোকসংখ্যা? হয়ত অবাক হবেন, মাত্র ৬০ জন। ১৯০৮ সালে এই বাউ দ্বীপ ২০০০ মাইল দূরে অস্ট্রেলিয়ায় একটি ক্রিকেট দল পাঠায়। শুনলে অবাক হবেন সেখানে একটি খেলার মধ্যে বাউ দ্বীপের জয়ের সংখ্যা ৫। অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় ১৬টি ম্যাচ।

বর্তমানে ফিজি দ্বীপের ৯টি মাঠে খেলা হয়ে থাকে। সুভার শেষপ্রান্তে এলবার্ট পার্ক এই দ্বীপের শ্রেষ্ঠ মাঠ। বড় বড় খেজুর ও তুমুর গাছ গোটা মাঠের চারদিক দেওয়ালের কাজ করে। লাউ আরচিপলাগাওয়ে সবচেয়ে ক্রিকেটের উত্তেজনা বেশী।

গাভাসকারের দল ফিজি দ্বীপে যে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের মোকাবিলা করবে তারা হোল: আইসোয়া সুকা (ফাস্ট বোলার), পেনি তারগাই, ইলিকেনা তুলি (দুরন্ত অলরাউণ্ডার), কেলেনারোড (বাঁহাতি ফাস্ট বোলার) এবং অধিনায়ক আইনোকে ভময়ামেতু।

এই সফরের শেষে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকেও ফিজি দ্বীপের ক্রিকেট দলকে ভারতে আনার কথা শুনছি। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই এইসব শুভেচ্ছা সফরের মাধ্যমে ফিজিয়ানরা ক্রিকেটের ব্যাপারে আরও আকর্ষণ অনুভব করবে এবং ওয়ার্ল্ড-ক্লাশ ক্রিকেটারদের পাশে নিজেদের নামসই করে তুলতে পারবে, এ আশা নিয়ে লেখা শেষ করলাম।

# সুরজিৎ ঃ বিদায় এবং লড়াই

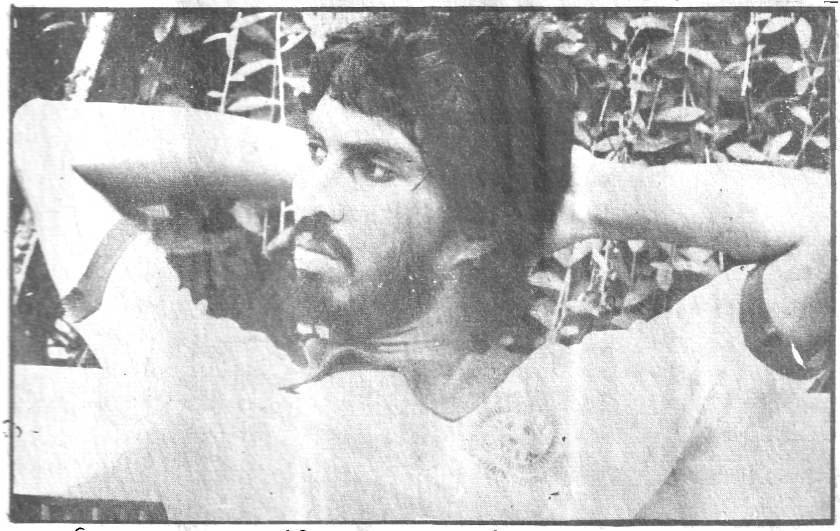
তপু দাশগুপ্ত

১৭ ফেব্রুয়ারি সুরজিৎ সেনগুপ্ত আন্ত-র্জাতিক ফুটবলের আসর থেকে অবসর [illegible] সিদ্ধান্ত ঘোষনা করলেন [illegible] কাছে সেইদিন দুপুরে এই খবর [illegible] পর আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে প্রচারিত [illegible] তার পরদিন প্রায় প্রত্যেক খবরের কাগজেই খবরটি প্রকাশিত হয়।

১৮ ফেব্রুয়ারীর দৈনিক পত্রিকায় অন্য একটি খবর সবচেয়ে আগে নজরে পড়েছে—একুশ জন ফুটবলারের সল্ট লেকের ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসা। এই খবরের পাশে সুরজিৎ সেনগুপ্তের আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের খবরকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।

নেহাৎই আকস্মিক যোগাযোগের ফলে প্রায় একই দিনে দুটি ঘটনা ঘটেছে। এক, সুরজিৎ আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিলেন এবং দুই, একুশ জন ফুটবলার ক্যাম্প থেকে চলে এলেন। ফলে কেউ কেউ মনে করেছেন যে এই একুশ জন ফুটবলারের ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসার মধ্যে সুরজিতের কোনো ভূমিকা আছে। সুরজিৎ যেহেতু সর্বসময়ই খেলোয়াড়দের সাথে থাকেন, এই ব্যাপারেও তিনি খেলোয়াড়দের পিছনে আছেন—এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। সুরজিৎকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এর পিছনে কোনো পলিটিক্স আছে কি না? একই সঙ্গে দুটি ঘটনা কী করে ঘটল? সুরজিৎ বললেন, "আজ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে অনেক অপপ্রচার হয়েছে। ব্যক্তিগত অনেক কারণে আমাকে অনেক ডিসিশন নিতে হয়েছে তার মধ্যে পলিটিক্সের কিছু ছিল না। তবে এই ধরণের মন্তব্য আগে অনেকেই করেছেন এখনও করছেন—এজন্য মোটেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি না। ওদের ক্যাম্প ছাড়ার সঙ্গে আমার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই।"

এ কথা সত্যি। কারণ, শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারী সুরজিৎ সেনগুপ্তর কাছ থেকে জানতে পারি যে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণ করতে চলেছেন। ১৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সল্ট লেকের ক্যাম্পে কোনো ঘটনাই ঘটে নি। সুরজিতের আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের পিছনে কতগুলো কারণ আছে। এক, সুরজিৎ বিবাহিত, সন্তান আছে। দু' বছর ধরে ক্যাম্পে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, কিছু পারিবারিক দায়িত্ব আছে। দুই, চোট নিয়ে দু'বছর ধরে সমানে ক্যাম্পে থাকা নিশ্চয় সম্ভব হতো না। আন্তর্জাতিক ফুটবলের মান অত্যন্ত উঁচু। শারীরিক অসুবিধার জন্য সেই উঁচু মানের খেলার সাথে তাল রাখা আর সম্ভব নয়।



সুরজিৎ সেনগুপ্তের আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের খবর প্রায় সব দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা এর ব্যতিক্রম। বহুল প্রচারিত এই দৈনিক পত্রিকাটিতে সুরজিতের অবসর গ্রহণের খবরটি প্রকাশিত হয়নি। এই দৈনিক পত্রিকার এক সাংবাদিক সুযোগ পেলেই (না পেলেও) সুরজিৎ সেনগুপ্ত সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করে থাকেন। এক্ষেত্রে নীরবতাকেই তিনি এবং তাঁরা হিরন্ময় মনে করেছেন।

সুরজিৎ ১৯৭২ সালে জুনিয়র ইণ্ডিয়া এবং ১৯৭৪ সালে সিনিয়র ইণ্ডিয়া প্রথম খেলেছেন। গত কয়েক বছরে যতটুকু আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলেছেন, তাকি দৈনিক পত্রিকায় তার অবসর গ্রহণের খবরকে স্থান দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না? ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত গত এশিয়ান গেমসে ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ফুটবল খেলেছেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। ব্যাঙ্ককে কুয়েতের বিরুদ্ধে ভারত ৬—১ গোলে হেরে যায়। এই ম্যাচে এশিয়ান মানে ভারত যে কতটা পিছিয়ে তা সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু সেই ম্যাচেও দ্রুতগামী, স্বাস্থ্যবান খেলোয়াড়দের সুন্দর পায়ের কাজে যিনি জ্বালাতন করেছিলেন, তিনি —সুরজিৎ সেনগুপ্ত। ঐ ম্যাচে যে কটি পাল্টা আক্রমণ হয়েছিল তার সবগুলোরই উৎস ছিলেন সুরজিৎ। এবং ঐ ম্যাচের একমাত্র গোলটিও তিনিই করেন। এশিয়ান গেমস থেকে ফিরে এসে বিখ্যাত কোচ অমল দত্ততো বটেই, এমন কি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নিশীথ ঘোষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিলেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে সুরজিৎই সবচেয়ে ভাল খেলেছেন। বিখ্যাত কোচ অমল দত্ত উপরোক্ত গোল প্রসঙ্গে বলেছেন, 'দেশে-বিদেশে সুরজিৎকে যে কটা গোল করতে দেখেছি তার মধ্যে এই গোলটিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আন্তর্জাতিক খেলায় যিনি এমন গোল করেন সেই সুরজিৎ সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই ভারতের গর্ব। আরব সফরেও সুরজিতের খেলা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। আরবের আবু ধাবি ক্লাবে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে খেলার জন্য সুরজিৎকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তখনই এক জার্মান কোচ সুরজিতের খেলায় দারুণ প্রশংসা করেন। যিনি ভারতের গর্ব, বিদেশেও যিনি সফল, তার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের খবর অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁর এই অবসর গ্রহণের খবরের মধ্যে কেউ রাজনীতি দেখছেন, কেউ বা সেটা উল্লেখ করতেই ভুলে যাচ্ছেন। সর্বাধিক প্রচারিত সেই দৈনিক পত্রিকাতে যখন এই খবরটিকে স্থান দেওয়া হয় না তখন কি তা নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা হিসাবে বিবেচিত হবে?

সুরজিৎ সেনগুপ্ত ১৯৭২-এ প্রথম জুনিয়ার ইণ্ডিয়া এবং ১৯৭৪-এ মারডেকায় প্রথম সিনিয়র ইণ্ডিয়া খেললেন। সেই বছর এশিয়ান গেমসেও টীমে ছিলেন। কোচ ছিলেন পি কে ব্যানার্জি এবং ক্যাপ্টেন মগন সিং। প্রসুন ব্যানার্জি এবং সুরজিৎ সেনগুপ্ত একই সাথে আন্তর্জাতিক ফুটবলে এসেছিলেন। তেহরানের এশিয়ান গেমসে প্রসুন কোনো ম্যাচ না খেললেও সুরজিৎ সেনগুপ্ত কয়েকটি ম্যাচ খেলেছিলেন। তারপর একমাত্র ঢাকাতে অনুষ্ঠিত ১৯৭৭ সালের আগা খাঁ গোল্ড কাপ ছাড়া সুরজিৎ সব টুর্ণামেণ্টেই খেলেছেন। ১৯৭৬ সালের কাবুল সফরকে এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না, কারণ এই সফরে ভারতের সেরা টীম যায় নি। ১৯৭৭ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আগা খাঁ গোল্ড কাপে প্রসুন ব্যানার্জি এবং শ্যামল ব্যানার্জি [illegible] 'কলকাতার আর কোনো খেলো-

যাড়ই যেতে পারেন নি কারণ সেইসময় ক্লাবগুলো আর কোনো খেলোয়াড়কে ছাড়ে নি। আর মজার ব্যাপার এই যে সিনিয়রিটি সত্ত্বেও সুরজিৎ সেনগুপ্তকে ভারতের সহ-অধিনায়ক বা অধিনায়ক করা হয় নি। আরব সফরে দেবরাজকে সহ-অধিনায়ক করা হল। বোঝা গেল সুরজিৎকে সহ-অধিনায়ক এবং পরবর্তীকালে অধিনায়ক করার ইচ্ছে নেই। সুতরাং এবার বিয়াশির এশিয়ান গেমসের ক্যাম্পে পরবর্তী পর্যায়ে যে তাঁকে ডাকা হতে পারে বা ফর্মে থাকলে তাঁকে অধিনায়ক করা হতে পারে এই বিশ্বাসও সুরজিতের মনে ছিল না। আরব সফরের আগে পাতিয়ালা ক্যাম্পে একটি ঘটনায় সুরজিৎ জড়িয়ে পড়েন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পাসপোর্ট রহস্যময়ভাবে হারিয়ে যায়। ফলে স্টপার মনোরঞ্জনের জায়গায় কেরলের উইং হাফ জেকবকে নেওয়া হয়। সুরজিৎ এই ঘটনার প্রতিবাদ করে মনোরঞ্জনের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করার জন্য কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন। কোচ বাসার সঙ্গেও সুরজিৎ এ ব্যাপারে কিছু কথা বলেন। বাসা কথা দিলেন—তিনি মনোরঞ্জনের ব্যাপারে চেষ্টা করবেন। ১৯৭৮ সালে চোটের জন্য মনোরঞ্জন এশিয়ান গেমসে যেতে পারে নি। ১৯৭৯ সালে পাসপোর্ট হারানোর অজুহাতে সেই মনোরঞ্জনই ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়ল। দিল্লি থেকে পাতিয়ালায় নুরুল আমিনের ট্রাংকলে কথা হলো কোচ বাসার সাথে। পরদিন বাসা মত পাল্টালেন। সুরজিৎ প্রতিবাদ করলেন। পাতিয়ালা ক্যাম্পে প্রায় বিদ্রোহের আবহাওয়া তৈরী হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক খেলোয়াড়ই সুরজিৎ সেনগুপ্তর সঙ্গে থাকলেন না। পরে পরিষ্কার হয়েছে, ভারতের প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট খোয়া গেলে একটি টেম্পোরারি পাসপোর্ট অতি সহজে যোগাড় করা যায়। উনআশিতে কোয়েম্বাটোরে সন্তোষ ট্রফির সময় এ আই এফ এফ-এর অন্যতম কর্মকর্তা ভিট্টল বলেছিলেন যে তিনি একদিনে টেম্পোরারি পাসপোর্ট যোগাড় করে দিতে পারেন। আর দিল্লিতে থাকলে সেটা এক ঘন্টায় করা যায়। আশ্চর্যের বিষয়, নুরুল আমিন দিল্লিতে থেকেও তা করতে পারলেন না। মনোরঞ্জনের বদলে কেরলের জেকবকে নেওয়ার একটাই কারণ ছিল, আসন্ন এ আই এফ এফ নির্বাচন। সেইজন্য নিজের স্বার্থে কেরলের টি আবদুল্লাকে দলে টানলেন নুরুল আমিন। এই প্রথম ভারতীয় ফুটবলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হল। নিজের স্বার্থ না দেখে অন্যের অসুবিধা, অন্যের জন্য কথা বলাকে অনেকে সুনজরে দেখেন না। এই সংগ্রামী সুরজিৎ সেনগুপ্তকে কর্তারা কিছুতেই ভাল চোখে দেখতে চাননি।

কোনো কোনো ক্লাবের কর্মকর্তাও এই কারণেই সুরজিতের উপর ক্রুদ্ধ। খেলোয়াড়দের উপর অন্যায় করা হলে সুরজিৎ প্রতিবাদ করেন। সুরজিৎ সেনগুপ্ত ভাল ফুটবলার, শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র। ভারতের অধিনায়ক হবার মতো সব কটি গুণই তাঁর মধ্যে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে ভারতের অধিনায়ক করা হয় নি। না করার পেছনে কারণ একটাই, তিনি ফুটবলারদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন। এই সংগঠনকে কর্মকর্তারা খুব ভয় করেন। উনিশশো একাশিতে এসে সুরজিৎ বুঝেছেন যে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল খেলা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর অধিনায়ক ?—সব গুণ থাকা সত্ত্বেও যে তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হবেনা, এই ধারনা অনেক আগেই তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। ভারতের অধিনায়ক হন নি। কিন্তু সুরজিৎ সেনগুপ্ত আন্তর্জাতিক ফুটবল যা খেলেছেন, এমন কি দেশের মাটিতেও যা ফুটবল তিনি খেলেছেন,



সুরজিৎ

তাঁর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর গ্রহণের খবর কি দৈনিক পত্রিকায় প্রাধান্য পাবার উপযুক্ত নয় ? ১৯৭৬ সালে পাখতাকোরের বিরুদ্ধে সুরজিতের খেলা সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। রাশিয়ার বিখ্যাত ফরোয়ার্ড ফেদারভের পাশেও সুরজিৎকে চিনে নিতে কোনো কষ্টই হয় নি। পায়ের কাজে সেদিন তিনি চমকে দিয়েছিলেন। ফুটবল যদি শিল্প হয় তা দেখিয়েছিলেন সুরজিৎ সেনগুপ্ত। আরারাতের বিরুদ্ধে শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান দুর্দান্ত খেলেছিল (২—২) এই আরারাতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে সুরজিৎও খুব ভাল খেলেছিলেন। প্রথমার্ধে একটা সময় মনে হয়েছিল সুরজিৎকে ধরার কেউ নেই। ১৯৭৯ সালের শীল্ড সেমিফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল এক গোলে পিছিয়ে ছিল। দুরূহ কোণ থেকে সুরজিৎ একটি দারুণ গোল দিয়ে এক গোলে পিছিয়ে থাকা টীমকে সমতায় নিয়ে যান।

২০ ফেব্রুয়ারি সুরজিৎ সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত তাড়াতাড়ি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিলেন কেন ? আপনি কি জানতেন পরবর্তী পর্য্যায়ে আপনাকে ডাকা হবে ?"

সুরজিৎ : "জানতাম না, কেউ জানায় নি। বুঝতেই পারছি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

—"আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলতে পারবেন না, কিন্তু ক্লাব ফুটবল খেলবেন কেন ?"

সুরজিৎ : "আন্তর্জাতিক ফুটবলের সাথে ক্লাব ফুটবলের অনেক তফাৎ। ক্লাব ফুটবলে দু বছর বাড়ির বাইরে থাকতে হবে না। আন্তর্জাতিক ফুটবলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা এখন আর সম্ভব নয়। ক্লাব ফুটবলে টেনশন্ থাকলেও মানটা আন্তর্জাতিক ফুটবলের মতো নয়।"

—"ক্যাম্পে থাকলে কি আপনিও ক্যাম্প ছাড়তেন ?"

সুরজিৎ : "ক্যাম্পে থাকলে এ রকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করতাম। খেলোয়াড়দের পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। তবে এমন সিদ্ধান্ত যাতে না নেওয়া হয় তার চেষ্টা করতাম এবং আশা করি সফলও হতাম।"

"ক্লাবে খেলবেন কেন ? টাকার জন্য ?

সুরজিৎ সেনগুপ্ত : "ফুটবলকে ভালবাসি। ফুটবলের প্রতি ভালবাসা না থাকলে ক্লাব ফুটবলও খেলতাম না। আর্থিক সুবিধার প্রশ্ন তো আছেই। ক্লাবের হয়ে মাসের পর মাস রোদবৃষ্টিতে খেলতে হয়, বিভিন্ন টুর্নামেন্টের জন্য বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। তাছাড়া ফুটবল খেলার জন্য যে ধকল শরীরকে নিতে হয় সেকথা ভাবলে আর্থিক সুবিধার প্রশ্ন এসেই যায়।"

—"কতদিন ক্লাব ফুটবল খেলবেন ?"

সুরজিৎ—"অন্তত দু বছর।"

চোট থাকায় গত বছর আশানুরূপ ফর্মে ছিলেন না। এবার নিজের ফর্ম ফিরে পাওয়ার যুদ্ধ সুরজিৎ ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। বিজয়গড়ের মাঠে অশোক চন্দ্রর সঙ্গে প্র্যাকটিস পুরোদমে চলেছে। মেরুন-সবুজ শিবির থেকে ডাকও এসে গেছে। শেষ পর্যন্ত যেখানেই খেলুন, আমরা আশা করি ফর্ম ফিরে পাবার যুদ্ধে তিনি জয়ী হবেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আশা করব, ময়দানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধও যেমন চলছিল, তেমনি চলবে।

১১ পৃষ্ঠার পর

বিশ্বাস করি। নিজের কাছে সাচ্চা থাকলে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন।"

বিদেশ এমনিতেই চাপা ছেলে। মুখ ফুটে নিজের কথা প্রায় কিছুই বলতে পারে না। শোকে ভেঙে পড়ে ও শুধু একটাই কথা বলেছে, "মোহনবাগানের ব্যাপারস্যাপারের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। [redacted] সবসময়ই আমাদের সঙ্গে থাকেন, এখনও আছেন—এটাই আনন্দের।"

ক্রোধে ফেটে পড়ে শ্যামল ব্যানার্জি আর কম্পটন দত্ত জানিয়েছে, "যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে পাবলিক লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে যে অফিসে বা পাড়ায় অপদস্থ হতে হচ্ছে না, এটাই আমাদের সৌভাগ্য। আর মোহনবাগান ক্লাব আমাদের হতবাক করে দিয়েছে। সম্মান-বোধ যদি একটুও থেকে থাকে, ঐ ক্লাবের পথ আর জীবনে মাড়াব না।" শ্যামল বলেছে, "মোহনবাগানে আসার পর থেকে অনেক প্রলোভনই এসেছে। কিন্তু সেদিকে হাত বাড়ানোর প্রয়োজন অনুভব করি নি। ক্লাবের সঙ্গে পরম আত্মীয়তায় জড়িয়ে পড়ার পুরস্কার হাতে-নাতেই পেয়ে গেছি। ছোট টীমে খেলব, সেও ভাল, দরকার হলে খেলা ছেড়ে দেব, কিন্তু মেরুন-সবুজ জার্সি আজ থেকে আমার কাছে অপবিত্র হয়ে গেল।" আর কম্পটন দুঃখমেশানো কণ্ঠে বলেছে, "সত্যি, এতবড় প্রতিষ্ঠানে আমাদের কথা ভাবার লোক মান্নাদা ছাড়া কেউই নেই। আমরা ওনার কাছে চিরঋণী।"

২২ ফেব্রুয়ারী সকালে নিজের বাড়ীর সিড়ির মুখে দাড়িয়ে গর্জে উঠল গৌতম সরকার —"কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। দুর্দিন এসেছে। সব অপবাদই সহ্য করে নিতে হচ্ছে। ক্লাবের লোক গিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন, গাড়ী পাঠালেন আমাদের নিয়ে আসতে আর সেই ক্লাব নাকি দেশপ্রেমিক। চমৎকার। ক্লাবের প্রতি ঘৃণায় মন বিষিয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের মুষড়ে পড়লে চলবে না, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। এখন আমাদের আটজনেরই একসঙ্গে চলা উচিৎ।"

ওদিন, বেলা সাড়ে দশটায় স্টেট ব্যাঙ্কের মেইন ব্রাঞ্চের এসটাবলিশমেন্ট ডিপার্টমেন্টে গেলাম। নিজের সিটে বসে রয়েছে সেই ফুট-বলারটি, প্রসূনেরই মতো গত সাত বছর ধরে যে মোহনবাগানের সেবা করে এসেছে। ভেবেছিলাম, হয় ও ক্রোধে ফেটে পড়বে, না হয় দুঃখে ভেঙে পড়বে। কিন্তু কোনোটাই নয়। খুব ধীর-স্থির-শান্ত কণ্ঠে ও জানাল, "শুধু ভাবছি। বাকী সাত-জনের সঙ্গে এখুনি কথা বলা দরকার। 'মোহন-বাগান' নামটা ভোলার চেষ্টা করছি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, সাসপেনশন তুলে নিলেও ঐ ক্লাবের সংস্পর্শ চিরকালের মতো ত্যাগ করা উচিৎ। ঐ ক্লাবে একটা লোককেই চিনতাম, মান্নাদা। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, ওনার মতো ভালো লোকের জায়গা আর বেশীদিন মোহনবাগান ক্লাবে নেই।" এরপরই একদম চুপচাপ হয়ে গেল ও। সদাহাস্যময়, কৌতুক-প্রিয় সুব্রত ভট্টাচার্যকে এত চুপচাপ কোনদিনও দেখিনি, কোনদিনও না। কিন্তু ওর নিঃশব্দ মুখ আমার হাজার প্রশ্নের হাজার উত্তর খেলে বেড়িয়েছে। শুধু যেন ওর মুখের রেখাগুলো নীরবে পড়ে যেতে হবে। মাঝে মাঝে শুধু ওর রগ দুটো ফুলে কেঁপে উঠেছে। 'প্রতিশোধ' আর 'বদলা'—এই দুটো কথা বড় নিঃশব্দেই জানিয়ে দিয়েছে ওর আবেদনময় আর শোকাহত দুটো চোখ। দু চোখের তারায় কীসের যেন আগুন সেদিন দেখেছিলাম, যা বলে বা লিখে বোঝানো কিছুতেই সম্ভব নয়।

এ লেখার আগে পর্যন্ত মিহিরের সঙ্গে দেখা করার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। ওর বক্তব্য পাঠকদের জানাতে পারলাম না। দুঃখিত।

●

ময়দানে যেন এখন দেশপ্রেমের জোয়ার আছড়ে পড়েছে। ফুটবলসংশ্লিষ্ট লোকেরা অর্থাৎ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাংবাদিকরা পর্যন্ত "আমরা দেশপ্রেমিক" লেখা একটা বিরাট নামাবলী গায়ে চাপিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিজে-দের গায়ের ঝাল মেটাতে, ফুটবলারদের প্রতি জমে থাকা এতদিনের বিদ্বেষ চরিতার্থ করতে, শিবিরত্যাগী ফুটবলারদের দিকে আঙুল উচিয়ে তাদের 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিয়ে এক মেকী দেশপ্রেমের স্রোতে এরা গা ভাসাচ্ছেন।

মোহনবাগানের সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি ধীরেন দে এবং উমাপতি কুমারও নাকি দুই মহান দেশপ্রেমী (!!)। এইসব দেশ-দ্রোহী (?) ফুটবলারদের ব্যবহার তাদের নাকি মর্মাহত করেছে।

ধীরেনবাবু, আপনি কোনো কারণে খেলো-য়াড়দের ওপর ক্ষুব্ধ হতেই পারেন, এটা মেনে নিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু কোনো খেলো-য়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে তার সঙ্গে একবারও কথা বলার প্রয়োজন থাকে না, এটা মানতে পারলাম না। আপনি ঐ আটজন ফুটবলারের সঙ্গে একটি আলোচনা সভায় বসে আপনার অভিযোগগুলো জানাতে পারতেন। ওদের উত্তর সন্তোষজনক না হলে শাস্তি দেওয়ার সমস্ত অধিকার এবং ক্ষমতা আপনার হাতে থাকত। কিন্তু আপনি এবং কুমারবাবু ফুটবলারদের অসুবিধের কথা বোঝার চেষ্টা না করে, ওদের 'টাইট' করার মনোভাব নিয়ে, সস্তা হাততালি আর বাহাদুরী কুড়ানোর লোভে যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সভা ডাকলেন, তাতে কিন্তু আপনার ক্লাবের দু-চারজন অতিবোদ্ধা সদস্য ছাড়া আর কোনো সভ্যেরই ঘৃণার দৃষ্টি থেকে রেহাই পেলেন না।

ধীরেনবাবু, যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৭৭ সালে কাবুলগামী ভারতীয় দলে আপনার দল থেকে অন্তত আটজন খেলোয়াড় ডাক পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতা লীগে দল দুর্বল হয়ে পড়বে, এই আশঙ্কায় আপনি মানস ভট্টাচার্য ছাড়া আর কাউকেই ছাড়েন নি। আপনার মহান দেশ-প্রেমকে তখন ক্লাবের কোন লকারে আটকে রেখেছিলেন? কুমারবাবুও তো তখন কোনো প্রতিবাদ করেন নি! ঐ বছরেই শেষ দিকে রোভার্স চলার সময় একই পরিস্থিতির মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে, আপনি প্রসূন ছাড়া আর কাউকে ভারতীয় দলে খেলতে যেতে দেন নি। আপনার এবং উমাপতি কুমারের গভীর দেশপ্রেমবোধকে তখন কে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ছিল? 'দেশপ্রেম' বা 'দেশদ্রোহিতা' শব্দ-গুলোর ওজন বড্ড বেশী। ভালমানুষের মুখোশ আঁটা আপনাদের মতো প্রতিহিংসাশীল মুখে এইসব ভারী বুলি মানায় না।

মোহনবাগানের আটজন ফুটবলার ক্যাম্প ছেড়েছে। যদি বলি তার জন্য মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ অংশত দায়ী, কথাটা নিঃসন্দেহে আপনারা দু'জন অস্বীকার করবেন। কিন্তু বড় ক্লাবগুলোর কর্তাব্যক্তিরা প্লেয়ারদের ফুঁসলিয়ে কানে কানে ক্যাম্প ছাড়ার মন্ত্র ঢুকিয়েছিলেন, এ প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। ক্লাবের সমস্ত কাজ সাধারণত ক্লাবের সম্পাদকের মতামত নিয়েই করা হয়ে থাকে। সুতরাং, মোহন-বাগানের লোকেরা কেন ক্যাম্পে যাতায়াত করছেন, এ সম্পর্কে ধীরেন দে নিশ্চয়ই অন্ধকারে ছিলেন না। শুধু তাই নয়, মোহনবাগানের প্রথম সারির কয়েকজন কর্মকর্তা ওই রাতে মোহনবাগান প্লেয়ারদের সল্ট লেক থেকে গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছেন। হায়, তখন যদি ওরা জানত, কী বিরাট আঘাত ওদের ওপর নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করছে।

মূল কথা, আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি যে, মোহনবাগানের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পূর্ব-পরিকল্পিত। প্লেয়াররা আগে ক্যাম্প ছাড়ুক তারপর ওদের শায়েস্তা করব—এই মনোভাব নিয়েই ধীরেন দে এবং উমাপতি কুমার প্রথম থেকে এগিয়েছেন। কিন্তু সচেতন পাঠক-পাঠিকারা, আপনারা একটু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। যে সব দুর্নীতি-পরায়ন কর্মকর্তার জন্য প্লেয়ারদের আজ এত অপবাদের শিকার হতে হচ্ছে তারাই আজ দুহাত তুলে দেশপ্রেমের নেশায় মেতেছেন। আপনাদের ঘৃণার আগুনে এইসব প্রতিহিংসা-পরায়ন বিশ্বাসঘাতকদের পড়িয়ে মারুন, যারা চটপট সরকারের প্রিয়পাত্র সেজে যাচ্ছেন। এই সব জঘন্য কর্মকর্তাদের কোনোদিনও ক্ষমা করবেন না, কোনোদিনও না।



বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দিয়েছি। শত্রুর সংখ্যা এত না বাড়ালেও হয়তো চলতো। কিন্তু মোটামুটিভাবে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলে ধরার চেষ্টায় কোনো ফাঁকি ছিল না। এ কথা সত্যি যে ময়দানের অনেক বাস্তুঘুঘুই এই পত্রিকার জন্য বেশ কিছু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। এ কথাও সত্যি যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাঠক-পাঠিকা আমাদের লড়াইয়ের মূল সুরকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মাঝে মাঝে আমাদের কোণঠাসা হয়ে পড়তে হয়েছে। মনে হয়েছে, ময়দানে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই কি শুধুমাত্র একটি পত্রিকার মঞ্চে দাঁড়িয়ে করা সম্ভব—যা প্রকাশিত হয় পনেরো দিনে মাত্র একবার? ব্যাপকতর দিগন্ত হঠাৎই উন্মোচিত হল। একটি উচ্চাকাঙ্খী দৈনিক পত্রিকার স্পোর্টস এডিটর হিসেবে লড়াইকে ব্যাপকতর করার সুযোগ এসেছে বলেই মনে হল।

স্বীকার করি, দৈনিক পত্রিকায় লড়াইয়ের তীব্রতা সব সময় বজায় রাখা সম্ভব নয়। সংবাদের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্যও রাখা হবে। এবং সেই বক্তব্য যে ব্যাপকতর পাঠক সমাজের কাছে অতি দ্রুত পৌঁছে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর একটা কথা। ক্রীড়া সাংবাদিকতা বলতে এত কাল দৈনিক পত্রিকার খেলার পাতাকে সমৃদ্ধ করাই বুঝিয়েছে। গত তিন-চার বছরে খেলার পত্রিকাগুলোও ক্রীড়াসাংবাদিকদের কাজ করার জায়গা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য এখনও নাক সিঁটকে বলেন, "খেলার পত্রিকাগুলো সব ব্যাঙের ছাতা, দৈনিক পত্রিকাই হল আসল ব্যাপার।" এই আসল ব্যাপারের চ্যালেঞ্জও অবশ্যই কিছু পরিমাণে প্ররোচনা যুগিয়েছে। দেখা যাক।

'খেলার কাগজ' আগের মতোই থাকল। লেখার ধরণ এবং চরিত্র পাল্টাচ্ছে না। আগের সব লেখকই থেকে গেলেন, আমিও। আমার সহযোগীরা হয়তো সব সময় আমাকে কাছে পাবার অভ্যাস থেকে ছিটকে গিয়ে দিন কয়েক অসুবিধা বোধ করবেন। আর কিছু নয়।

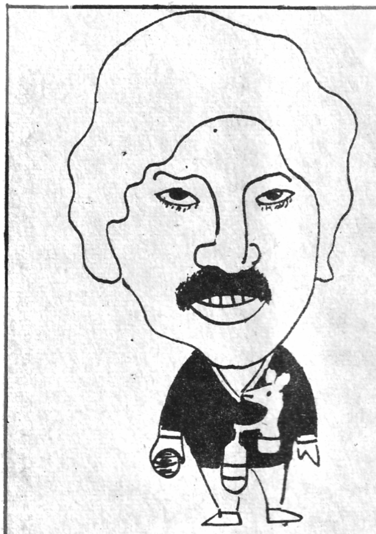
৭ ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজারে একটা বড় খবর বেরিয়েছে: "এতোদিন আই এফ এ-র প্রাঞ্জল ও সুসম্বদ্ধ কোন সংবিধান ছিল না। বর্তমান পরিচালকরা যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছেন।" স্টাফ রিপোর্টার আগের প্যারাগ্রাফে এ কথাও জানিয়ে দিতে ভোলেন নি যে "বাংলার ফুটবলের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সাহসী এই প্রয়াস।"

লীগের কাঠামো পাল্টানোর কথা ভাবা হচ্ছে। এবং, ক্লাব কর্মকর্তাদের হাত শক্ত করা হবে। কোনো ক্লাবের সাসপেন্ড-করা খেলোয়াড় দল পরিবর্তন করতে পারবে, কিন্তু শাস্তির মেয়াদকাল পর্যন্ত খেলতে পারবে না। ক্লাব যোগ্য কারণে শাস্তি দিয়েছে কি না আই এফ এ-র একটি বিশেষ কমিটি তা খতিয়ে দেখবে। তাছাড়া, খেলার সময়ে এবং পরে খেলোয়াড়দের আচরণ লক্ষ্য করার জন্য কয়েকজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হবে। বিশেষ কমিটির সদস্য বা পর্যবেক্ষক হিসেবে নিশ্চয় আই এফ এ-র পরিচিত কর্তারাই থাকবেন।

প্রস্তাবের খুটিনাটি বিবরণ চোখের সামনে নেই। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি, ফুটবলারদের 'টাইট' করার চক্রান্ত খুব আটঘাঁট বেঁধে করা হচ্ছে। প্রশ্ন শুধু একটাই, যারা এই সব আইন করছেন, তাদের শাস্তি দেবে কে? অশোক মিত্র এবং বাংলার যে অপদার্থ নির্বাচকদের জন্য রাউরকেল্লায় বাংলার সম্মান ধুলোয় লুটোল, তাদের বিচার কে করবে?

বিচার করবেন বাংলার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণ। এবং সুবিচারের স্বার্থে, সব তথ্য সরবরাহ করবে 'খেলার কাগজ'। অর্থাৎ অশোক দাশগুপ্ত সম্পাদক না থাকলেও, 'খেলার কাগজ' যা ছিল, তাই থাকছে। সম্পাদক হিসেবে আমাকে বিদায় দিন। লেখক হিসেবে আসছি পনেরো দিন পরেই। যথারীতি।

## ছবির ছড়া

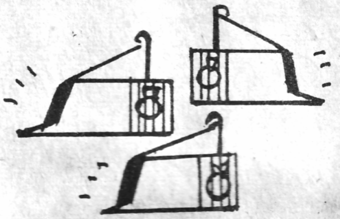


এক

কপিল কপিল কপিল

পকেটস্থ AUSTRALIA

কাক বনেছে কোকিল।



দুই

তিন প্রধান তিনটি দল

ধরতে Player পাতল কল।




তিন

বিশ্বজিৎ ভট্ট

ঐতিহাসিক গোল পেয়েছে

এখন মেলা ভক্ত।

**পরিচয় গুপ্ত**

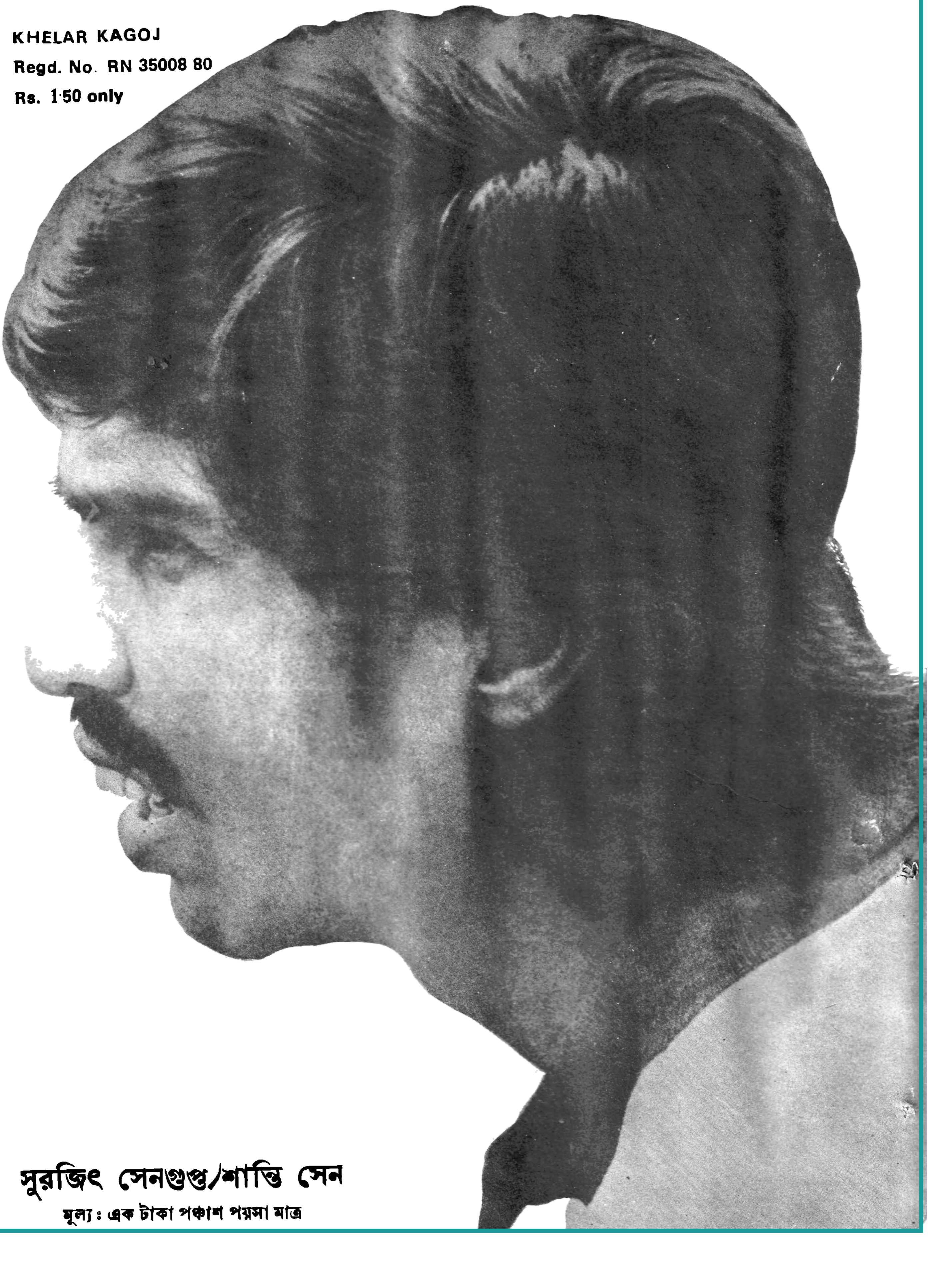


খেলার কাগজের পক্ষে শ্রীমতী দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন সেলস্ কনসার্ন, ৬৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীনিতাই পদ কুণ্ডু কর্তৃক দীপ্তি প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস, ৯৩এম আরিফ রোড, কলিকাতা-৬৭ হইতে মুদ্রিত।



অ্যাণ্ডি রবার্টস

KHELAR KAGOJ
Regd. No. RN 35008 80
Rs. 1·50 only



সুরজিৎ সেনগুপ্ত/শান্তি সেন

মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র